শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রণতি-স্তুতিঃ

শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাঙ্ঘ্রীন গণৈঃ সহ।
বন্দে প্রসাদতো যেষাং সর্ব্বারম্ভাঃ শুভঙ্করাঃ।।

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
বর্ণধর্ম-নির্ব্বিশেষ সর্ব্বলোকনিস্তরম্।
শ্রীসরস্বতীপ্রিয়ঞ্চ ভক্তিসুন্দরাশ্রয়ং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্‌গুরুম্।।

গৌরবাগ্বিগ্রহং বন্দে গৌরাঙ্গং গৌরবৈভবং।
গৌর-সংকীর্ত্তনোন্মত্তং গৌরকারুণ্য-সুন্দরম্।।

গুরুরূপহরিং গৌরং রাধারুচিরুচাবৃতম্।
নিত্যং নৌমি নবদ্বীপে নামকীর্ত্তননর্ত্তনে।।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ সন্দৌ তমনুদৌ।।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত

শ্রীশিক্ষাষ্টকের

অমৃতপ্রভাভাষ্য সম্বলিত নির্গলিতার্থ

প্রবক্তা

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-

সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত

কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের

কৃপানির্দ্দেশে

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ

কর্ত্তৃক

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

হইতে প্রকাশিত

অনুবাদক ঃ
ডাঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী, এম্. এ, পি. এইচ. ডি.,
(উৎকল), এম্. এ. (সংস্কৃত), এম্. এ. (সাংবাদিকতা),
(কলিকাতা), কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাংখ্য-বেদান্ত-
সাহিত্য শাস্ত্রী (ঢাকা), অবসরপ্রাপ্ত ও, এস, এস, অধ্যক্ষ,
ডাইরেক্টর, জগন্নাথ রিসার্চ সেণ্টার, উড়িষ্যা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথি
বঙ্গাব্দ ১৩৯৭, খৃষ্টাব্দ ১৯৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
বঙ্গাব্দ ১৪১৩, খৃষ্টাব্দ ২০০৭

ঃ সর্বপ্রধান কেন্দ্র ঃ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন নং-৭৪১ ৩০২
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪০ ০৮৬/২৪০ ৭৫২
E-mail : math@scsmath.com **Website :** http://www.scsmath.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দমদম পার্ক, ৩নং পুকুরের নিকটে
কোলকাতা-৭০০ ০৫৫
ফোন ঃ ২৫৯০৯১৭৫ / ২৫৯০৬৫০৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌরবাটসাহী,
পুরী, উড়িষ্যা। পিন নং-৭৫২ ০০১
ফোন ঃ (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৯৬, সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা,
উত্তরপ্রদেশ-২৮১ ১২১
ফোন নং ঃ (০৫৬৫) ২৪৫৬ ৭৭৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ-হাপানিয়া, জেলা-বর্দ্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ঃ (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালী চিড়িয়ামোড়
কোলকাতা-৫২
পিন নং ঃ ৭০০০৫২
ফোন নং ঃ (০৩৩) ২৫৭৩৫৪২৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ-গোবর্ধন, মথুরা
উত্তর প্রদেশ-২৮১ ৫০২
ফোন নং ঃ (০৫৬৫) ২৮১৫ ৪৯৫

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
বামুনপাড়া, বর্ধমান।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দারপাড়া,
নিউ পালপাড়া (নেতাজী সরণী)
শিলিগুড়ি-৬

ওঁ বিষ্ণুপাদ বিশ্ববরেণ্য

শ্রীল শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য

শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
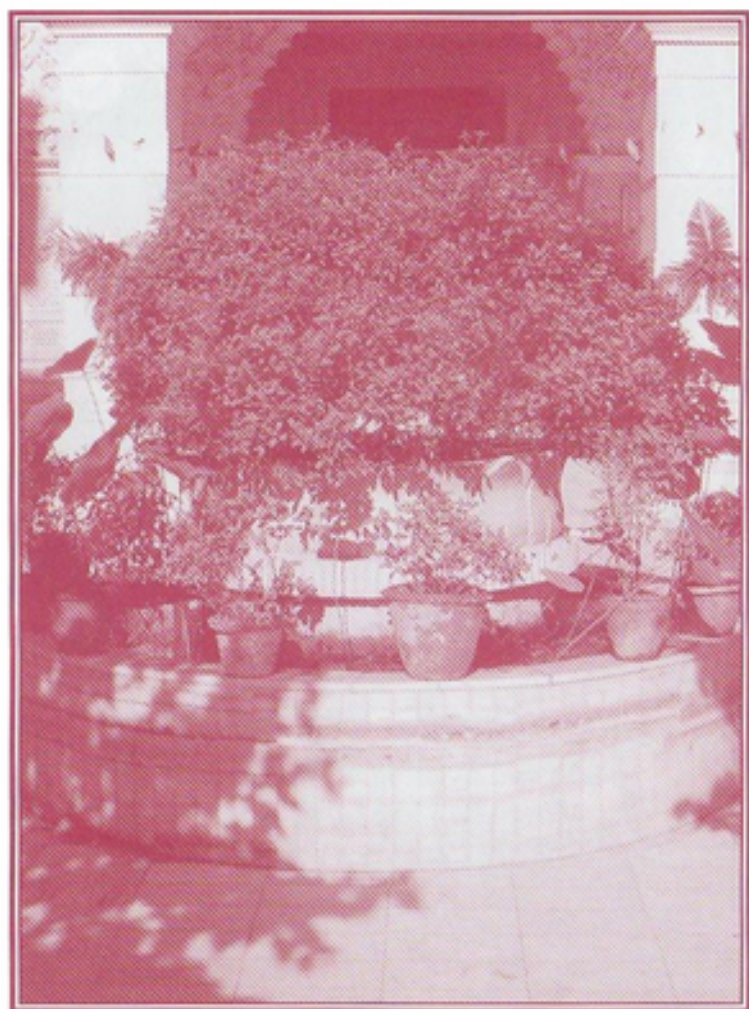
তুলসী মহারাণী

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের সেবিত

শ্রীশ্রীগুরু - গৌরাঙ্গ - গান্ধর্বা - গোবিন্দসুন্দরজীউ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সর্ব্বোত্তম দান

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

"গৌড়-দেশীয় সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বানুভবের মানদণ্ড বলিতে—যাহা গৌড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসাশ্রমে উদিত হইয়াছে ; উহাই গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে উদিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ করুণালোক সঞ্চারিত ও বিতরিত হইয়া জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছে। ইহাই সমগ্র আর্য্যভূমির বা ভারতের প্রাপ্তি বা সংসিদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদাময় দানের সর্ব্বোত্তম পদার্থ।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশিক্ষাষ্টকের পরিচয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকেই অভিধেয়-মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ সাধন ; দ্বিতীয়ে তাদৃশ শ্রেষ্ঠ সাধনে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি ; তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনাম-গ্রহণ-প্রণালী ; চতুর্থে প্রতিকূল বাঞ্ছা বা কৈতব বর্জন ; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপ-জ্ঞান ; ষষ্ঠে কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্য বর্ণন ও সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভরস-বর্ণন এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয়-মূলে 'সম্বন্ধ'-জ্ঞানের শিক্ষা, আটটি শ্লোকেই 'অভিধেয়' এবং শেষ তিনটি শ্লোকে 'প্রয়োজন' বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয়-বিচারে 'সাধন-ভক্তি', পরের দুটি শ্লোকে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' প্রস্ফূটিত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

ভগবদ্গৌরচন্দ্রানাং বদনেন্দুসুধাত্মিকা।
ভক্তোক্তৈর্বেশিতা শ্লোকা ভক্তভাবোদিতা যতঃ।।

—শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী

প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে।।

—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন যে শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ গ্রন্থ দুইখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লেখা,—সত্যি যদি তাহা হইত তাহা হইলে আমাদের তাহার চেয়ে আর আনন্দের কি থাকিতে পারে?" এই ছোট্ট মন্তব্যটুকু হইতেই বুঝা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্ব রচনা পাইবার জন্য ভক্তবৃন্দের কত আকাঙ্খা—কত আর্ত্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ-দশায় তাঁহারই শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত "শ্রীশিক্ষাষ্টক"। তাহাই আজ তাঁহার অনুগত জনগণের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের এই ব্যাকুল প্রচেষ্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথাই ধরুন—পৃথিবীর বিবিধ ভাষায় বিভিন্ন আচার্য্যগণের অনুভূত ব্যাখ্যা বা টীকার সংখ্যা কবেই সহস্র অতিক্রম করিয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও তাহার প্রকাশের বা প্রচারের কোন ঘাটতি দেখা যায় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই দুই প্রকারের বাংলা অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীশিক্ষাষ্টকেরও সংস্কৃত

সম্মোদন ভাষ্য, গীতিময়রূপদানাদির দ্বারা বহুল প্রকার করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তৎসত্ত্বেও তাঁহার স্বরচিত বিবৃতি আদির দ্বারা তাহা আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মূলতত্ত্বের যিনি যতটুকু আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, জগতের কল্যাণের জন্য তিনি সেটুকু প্রাণ ভরিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তাহাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই জন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।"

এই শ্লোক শুনিয়া নিজে আত্মবিস্মৃত হইয়া "ভূরিদা ভূরিদা" বলিতে বলিতে তাঁকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তনতনু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী। তাই তাঁহার করুণাকল্পবৃক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রপক্ক ফল এই শ্রীশিক্ষাষ্টক আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী কিভাবে আস্বাদন করিতে করিতে আপামরে বিতরণ করিয়াছেন তাহাই জগৎকে জানাইবার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্রপ্রয়াস। তাঁহার ব্যাখ্যার অপূর্ব্ব ভাবগাম্ভীর্য্যের একটু নমুনা প্রদানের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাই শ্রীশিক্ষাষ্টক ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমোন্মাদ-লীলা সম্পর্কে তাঁহার কতিপয় কথা মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে সুতীব্র বিরহ-বেদনা অনুভব করেছিলেন যা অনলের ন্যায় দগ্ধ করেছিল তাঁকে, সেই দহনময় বিরহ-বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে শ্রীশিক্ষাষ্টকরূপে। শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রমে তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে—

শ্রীস্বরূপরায়সঙ্গগম্ভীরান্তলীলনং
দ্বাদশাব্দবহ্নিগর্ভবিপ্রলম্ভশীলনম্।
রাধিকাধিরূঢ়ভাবকান্তিকৃষ্ণকুঞ্জরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্।।

'আপন অনন্ত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের আস্বাদনের গভীরে ডুব দিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর ভাবকে চুরি করলেন এবং তাঁর উজ্জ্বল কান্তির প্রচ্ছন্নবেশ গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর নিগূঢ়তম আত্মপ্রকাশ-লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরের জন্য তিনি দিব্য বিরহ-মিলনময় ভাবে গভীরভাবে বিভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন, তন্ময় বা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর একান্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন স্বকীয় হৃদয়ের অন্তরঙ্গতম, নিবিড়তম মহাভাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুতীব্র বিরহ-যন্ত্রনায় তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উদ্গীর্ণ হয়েছিল অপ্রাকৃত প্রেম-আগ্নেয়গিরির দিব্য চিদানন্দ-প্রবাহ। তাঁর শিক্ষানিচয় যা শ্রীশিক্ষাষ্টকরূপে সুবিদিত, তাই তাঁর শ্রীমুখপদ্ম থেকে উৎসারিত হয়েছিল যেন আগ্নেয়গিরির সোনার লাভা-স্রোতের ন্যায়। আমি সেই দিব্য প্রেমের সোনার আগ্নেয়গিরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হই।'

শ্রীশিক্ষাষ্টক-রূপে তিনি তীব্র দহনময় শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণাময় অগ্নি উদ্গীরণ করেছিলেন। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একটি সোনার আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং শিক্ষাষ্টক এর তুলনা টানা হয়েছে লাভার সাথে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে 'বিরহ'ই হোলো অপ্রাকৃত জগতের সর্ব্বোচ্চতম আদর্শ। ঠিক যেমন অত্যন্ত নিবিড় আনন্দ-মাধুর্য্যের ধারণা বা অনুভূতি হোলো শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ তেমনি

নিবিড়তম বেদনার ধারণা বা অনুভূতি হলো শ্রীকৃষ্ণবিরহ। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের যন্ত্রণার অনুভূতি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের গাঢ় আনন্দানুভূতির চেয়েও অনেক বেশী গভীর রূপে অন্তরে অনুভূত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না কি অসীম যন্ত্রণাময় অবস্থায় তুমি রয়েছো? তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, তা নাহলে তুমি তো এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ পরিত্যাগ করতে!—এটি নিশ্চিতই অচিন্ত্য সত্য যে আমরা সম্পূর্ণই তাঁর। কেননা তিনিই আমাদের সর্বস্ব, অথচ আমরা তাঁকেই দর্শন করতে পারি না! আমাদের জোর করে তাঁর নিকট থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। কেমন করে আমরা তা সহ্য করতে পারি?' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একসময় বলেছিলেন,—'আমি আর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না ; আমি আর কোনক্রমে দুই-চারিদিন মাত্রই বেঁচে থাকব এবং তারপরে নিশ্চিতই আমাকে এই শরীর পরিত্যাগ করতে হবে।'

শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার অর্থই হোলো প্রকৃত দিব্য জীবন লাভের জন্য সেই শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত্যর্থে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করা। প্রাথমিক অবস্থায় এই অপ্রাকৃত প্রেম আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হল সঞ্জীবনি সুধা, অমৃতময় জীবন। এই সাধারণ পার্থিব জগতেই বহুব্যক্তি তাদের এই পার্থিব ভালবাসাতেই হতাশাগ্রস্ত, জর্জরিত হয়ে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। তারা কখন কখনও পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে থাকে কারণ তারা সেই ভালবাসার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ থেকে যে তীব্র বেদনার উদয় হয় সেটিকে যদিও লাভার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু তা লাভার ন্যায় ক্ষতিকর নয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়   ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৫০)

—'দিব্য কৃষ্ণপ্রেমের অত্যদ্ভুত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য হোলো যে যদিও বাহ্যতঃ এই বিরহ-প্রেম হোলো জ্বলন্ত জ্বালাময় লাভার ন্যায়। কিন্তু ভিতরে এ হলো সুমিষ্ট সুধাসার যা সমগ্র অন্তরকে অপূর্ব্ব দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে।'

যদিও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সুতীব্র বিরহ-যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন তথাপি তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীরে আস্বাদন করেছিলেন সুগভীর সুখময় আনন্দোল্লাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমলক্ষণ-সমূহ সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বা কোন শাস্ত্রসমূহেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর চরিত্রে আমরা পরাৎপর ঈশ-তত্ত্বের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ বা স্বরূপ লক্ষ্য করি। এটি আমার প্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রমে পরিব্যাখ্যাত হয়েছে (৬৬) ঃ

আত্মসিদ্ধসাবলীলপূর্ণসৌখ্যলক্ষণং
স্বানুভাবমত্তনৃত্যকীর্ত্তনাত্মবণ্টনম্।
অদ্বয়ৈকলক্ষ্য-পূর্ণতত্ত্বতৎপরাৎপরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্।।

'এটি হোলো সর্ব্বসামঞ্জস্যকারী, সর্ব্বজয়ী সিদ্ধান্ত। সর্ব্বোচ্চ পরতত্ত্বের ধারণা, অনুভব বা প্রকাশ নিশ্চিতরূপেই সর্ব্বোত্তম আনন্দ-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হলেন আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, সদা আপন মাধুর্য্য আস্বাদনরত এবং দিব্য আনন্দভরে নৃত্যরত। তাঁর সুপবিত্র, দিব্য নামই তদীয় দিব্য আনন্দের

কারণস্বরূপ, এবং তাঁর সেই পবিত্র শুদ্ধ নামই হোলো অপ্রাকৃত আনন্দের পরিপক্ক ফলস্বরূপ যা সংকীর্ত্তনমাঝে প্রকাশিত হয়েছে। অনন্ত শক্তিমান সৃজন-কর্ত্তা আপন আনন্দ-শক্তি সৃজন করে চলেছেন যা স্বয়ং তাঁকে নৃত্যলীল করে তোলেন এবং তাঁর সংকীর্ত্তন সেই আনন্দাস্বাদকে সকলের নিকট বিতরণ করেন।

এইরূপে সেই পরমসুন্দর সুবর্ণ-বরণ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ইঙ্গিত, প্রতিটি বিচরণ-ভঙ্গীমা আপন লীলামাধুর্য্যে রচনা করেছেন তাঁরই আনন্দ রস ঘন-লীলা-বিলাস।"

ইতিপূর্ব্বে শ্রীশিক্ষাষ্টক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার "দি গোল্ডেন্ ভল্ক্যানো অফ্ ডিভাইন্ লাভ্' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়া নবরূপে প্রকাশিত হইলেন। অনুবাদের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার আমাদের পরম শুভাকাঙ্খী বান্ধব সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর প্রফেসর ডঃ শ্রীদোলগোবিন্দ শাস্ত্রীজী। তাঁহার এইপ্রকার সহায়তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

পরিশেষে অদোষদরশী বৈষ্ণবগণের প্রতি ও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের প্রতি আমাদের সদৈন্য নিবেদন এই যে যেহেতু আমরা সত্যই জানিনা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁহাদের কতটুকু তৃপ্তি বিধান করিবে ; কিন্তু আমাদের প্রকাশনার অযোগ্যতা যদি তাঁহাদের কোনপ্রকার অতৃপ্তির কারণ হয় তবে তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করেন—এই প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত—

প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।। ১ ।।

অনুবাদ ঃ

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করে। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-দাবানলকে নির্বাপণ করে। সন্ধ্যায় যেমন চন্দ্রের শীতলজ্যোৎস্নায় কুমুদপুষ্প বিকশিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনামরূপ অমৃতধারায় হৃদয়-উল্লসিত হয় এবং শেষে আত্মার অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হয়। সেই প্রেমামৃত পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করে আত্মা প্রেমপারাবারে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হয়। আত্মার যাবতীয় বিভাব পরিপূর্ণ সন্তোষ লাভ করে এবং পবিত্র হয় এবং সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণনামের প্রভাব বিজয়লাভ করে।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। তিনি বলছেন,

"আমি কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করতে এসেছি এবং এই নাম পৃথিবীর কোণে কোণে প্রবেশ করবে।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।

সংকীর্ত্তনের অর্থ কি? 'সম্যক্' মানে সম্পূর্ণ এবং 'কীর্ত্তন' মানে উচ্চারণ, এই দুইটি শব্দ মিলেই হয় সংকীর্ত্তন যার সাধারণ অর্থ হল অনেকে একত্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ। কিন্তু সম্যক্ বলতে কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, গুণের দিক্ থেকেও সম্পূর্ণ—not only in quantity, but also in quality. Full quantity হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে অনেক অর্থাৎ গোষ্ঠী নিয়ে কীর্ত্তন আর full quality হল সম্পূর্ণ গুণকীর্ত্তন ; সম্পূর্ণ গুণকীর্ত্তন কেবল কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেবতার হতে পারে না। সুতরাং সংকীর্ত্তন মানে সম্পূর্ণ কীর্ত্তন, পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপের গুণকীর্ত্তন, অন্য কোন স্বরূপের কীর্ত্তন কেবল আংশিক এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত। তাই কৃষ্ণেরই গুণকীর্ত্তন দরকার, তাঁর মহিমাই কীর্ত্তন করা চাই, কারণ তিনিই ত সব। তিনিই প্রভু, ভাল-মন্দের ফলদাতা—সব কিছুরই সর্বোচ্চ নিয়ামক। যা কিছু, সবই তাঁর থেকে। জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা হয় তাঁকে পাওয়াতেই। যেমন একটা ঘোড়ার লাগাম থাকে তার ইচ্ছামত ছুটোছুটি যাতে না করতে পারে ; কিন্তু লাগাম খুলে দিলে সে ইচ্ছামত দৌড়াতে পারে। কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন বা প্রশংসা যদি কোনও জাগতিক কামনা-বাসনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তবে তা সোজাসুজি গিয়ে সর্বোচ্চ কারণ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়।

'শ্রী' শব্দের অর্থ লক্ষ্মীদেবী—কৃষ্ণের শক্তি। এতে বোঝা যায় যে সংকীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণ তাঁর শক্তি সহিত উপাসিত হন। কারণ কৃষ্ণের শক্তি ত' কৃষ্ণের মধ্যেই রয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত হবে। কোনও বাধা না পেয়ে তা বিজয় লাভ করবে; "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" তা হৃদয় থেকে আপনা আপনি কোন বাধা না পেয়ে স্বতঃই উচ্চারিত হবে। আরও তা ঐকান্তিক, স্বাধীন ভাবে হবে, তাতে কোনও বাধা থাকবে না। এবং কৃষ্ণের এই যে কীর্ত্তন, তা অনেকে মিলে সমবেতভাবে করবে—এই রকম কীর্ত্তনের যে vibration বা ভাবতরঙ্গ তা সমগ্র জগতেরও মঙ্গল-কারক। কেবলমাত্র শরণাগতি ও শুদ্ধভক্তির দ্বারাই আমরা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করতে পারি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনম্ ঃ

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করার সময় আমরা কি কি stage, অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই? প্রথম অবস্থা হল এই যে, নামকীর্ত্তন আমাদের চিত্তকে নির্মল করে। আমাদের চিত্ত বা মন একটা আয়নার মত। যদি ঐ মনরূপ আয়নাতে ধূলো জমে যায়, তা হলে আমরা সব জিনিষ ভাল করে দেখতে পাই না। আর শাস্ত্রের উপদেশগুলি তাতে ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। মনের আয়নায় যে সব ধূলো জমে যায়, সেগুলো কি কি? আমাদের অসংখ্য কামনা-বাসনা—যেগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হতে থাকে এবং যোজনাবদ্ধভাবে মনকে গ্রাস করতে থাকে, সেগুলিকেই মনের ধূলো বলা হয়।

আমাদের হৃদয় ও মনে সেই ধূলোই স্তরে স্তরে জমতে থাকে তাই আমরা কোনও জিনিষ ঠিকভাবে দেখতে পাই না। চিত্তপটে সেগুলি প্রতিফলনও ঠিকভাবে পড়তে দেয় না। জাগতিক কামনা-বাসনা আমাদের মন ও চিত্তকে এইভাবে আবৃত করে রাখে।

"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রথম কাজ হল—মনকে পরিষ্কার

করা। বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আমরা যদি আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কোনও ফলের প্রত্যাশা না করে ঠিকভাবে করতে পারি, তখন আমরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারি। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে—নাম-সংকীর্ত্তনের প্রথম ফলই হল বর্ণাশ্রম ধর্মের শেষ ফল—মন ও চিত্তের বিশুদ্ধি। তখনই আমরা বৈদিক উপদেশগুলি বুঝতে পারি।

নামসংকীর্ত্তনের পরবর্ত্তী ফল হল—'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনম্'—জন্ম-মৃত্যু-চক্ররূপ সংসার-দাবানলের প্রশমন। আমরা বিভিন্ন যোনিতে নানা প্রকার দেহ নিয়ে বারবার জন্মাই ও মরি। আত্মা দেহের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই সংসার-সাগরের তরঙ্গে নানাভাবে হাবুডুবু খেতে থাকে। নাম-সংকীর্ত্তনের প্রভাবে আমাদের আত্মা এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পায়। এইটাই হল নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় ফল।

প্রথম অবস্থায় বুদ্ধি শুধু হয়, দ্বিতীয় অবস্থায় নামপ্রভু ত্রিতাপের জ্বালা থেকে মুক্তি দান করেন। এই ত্রিতাপ হল **আধ্যাত্মিক** অর্থাৎ দেহ ও মনের সন্তাপ, যেমন রোগ ও মানসিক দুঃখ, উদ্বেগ ; **আধিভৌতিক**—পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুঃখ-যন্ত্রণা। আর **আধিদৈবিক** বলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বাত্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আমরা এই তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করে থাকি। তা আগুনের মত আমাদের হৃদয়কে অনবরত জ্বালা দিতে থাকে। কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বিতীয় ফলেতে ঐ আগুন চিরদিনের জন্য প্রশমিত হয় এবং আমরা শান্তিলাভ করি।

জীবনের চরম লক্ষ্য ঃ

পরবর্ত্তী অবস্থা হল—"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্"—কৃষ্ণনাম আমাদের জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

উক্ত দুইপ্রকার negative engagements—অর্থাৎ নেতিবাচক অবস্থা দূর হওয়ার পর আমাদের positive engagement অর্থাৎ ইতিবাচক ফলপ্রাপ্তি আরম্ভ হয় এবং শেষে আমাদিগকে বাস্তব বস্তু—reality বা real Truth অর্থাৎ বাস্তব সত্য—যা শাশ্বত, শুভদ ও সুন্দর, সেখানে পৌঁছে দেয়। তা আমাদের এমন শুভদ বস্তুর নিকট পৌঁছে দেয় যা এই জগতের সুখ-দুঃখের অতীত, অনেক ঊর্দ্ধে এবং আমরা অনায়াসে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যাই। কৃষ্ণনাম কীর্তনের দ্বারা এইরূপই সর্বশুভদ সর্বোত্তম কল্যাণ প্রাপ্তি হয়। আমরা যদি এই কথাটাকে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, তবে দেখতে পাব যে, এই state-এ কৃষ্ণনাম আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে একটা personal relationship—একটি ব্যক্তিগত স্নেহ সম্পর্ক গড়ে তোলার অবস্থায় নিয়ে যায়—যে সম্পর্ক শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি রসের আখ্যা পেয়ে থাকে। শ্রেয়ঃ বলতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণাই বুঝায় ; কারণ কেবল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণার দ্বারাই আমরা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতিসেবার সৌভাগ্য পেতে পারি—

'নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে'

এর পরবর্ত্তী stage হল—'বিদ্যাবধূজীবনম্'। কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতির জন্য প্রস্তুত করে, যে শরণাগতি কেবল Conjugal Love, মাধুর্য্যরসেই দেখা যায়, যেখানে ভক্ত পরাবিদ্যাশ্রিত হয়ে কৃষ্ণের পাদপদ্মে অনন্তকালের জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।

এর পরবর্তী stage হলে 'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্'। যখন আমরা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের ফলে proper level-এ উপযুক্ত স্তরে পৌঁছে যাই, তখন আমরা আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধস্তরে অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরের সন্ধান পাই। আমরা যে পরিমাণে শরণাগত হই, কৃষ্ণনাম সেই পরিমাণে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। যখন

আমাদের শরণাগতি চরম অবস্থায় পৌঁছায়, তখন আমরা একটি এমন অপ্রাকৃত আনন্দের আস্বাদন পাই, যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন হয়েও নিত্য নবনবায়মান এবং তা static নয়, always dynamic; তা স্থির নয়, সবসময় গতিশীল। তখন আমরা একটি নূতন জীবন ও নূতন দিব্যানন্দের সন্ধান পাই। সেই আনন্দরসের আস্বাদন stale or static নয়, তা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নিত্য নূতন আনন্দ-সমুদ্রের আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করেন—প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।

সর্বাত্মস্নপনম্ ঃ

কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের শেষ ফল হল—সর্বাত্মস্নপনং purification of our entire existence—আমাদের সত্তার সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি। নামকীর্ত্তনের যে আনন্দরস-সম্ভোগ, তা অপবিত্র করে না, পরিশুদ্ধ করে, পবিত্র করে। সম্ভোগ অর্থ exploitation ; জাগতিক জড়সম্ভোগ একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—creates a reaction এবং সম্ভোগকারীকে অপবিত্র করে, কিন্তু এখানে যখন স্বয়ং কৃষ্ণই ভোক্তা, তখন তার ফল হল পবিত্রতা, বিশুদ্ধি। কেন্দ্র থেকে যা কিছু সম্ভোগ আসে, কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছায় যা কিছু আসে, সেসবই আমাদিগকে পবিত্র করেন, শুদ্ধ করেন।

এই শ্লোকে সর্বাত্মস্নপনং শব্দের অর্থই হচ্ছে এই যে, আত্মার যাবতীয় বিভাব পরিপূর্ণরূপে সন্তোষ, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ লাভ হয়ে থাকে। আর সর্বাত্মস্নপনের আর একটা অর্থও আছে। আমরা যদি অনেকে মিলে নামসংকীর্ত্তন করি—কৃষ্ণের রূপ-গুণ-যশ ও লীলার কীর্ত্তন করি, তখন আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বিশুদ্ধি লাভ করতে পারি। কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়ে এমন কি সেই চিন্ময় শব্দ ব্রহ্মের

সম্পর্কে যে কোন প্রাণী এলে সেও পবিত্র হয়ে যায়। 'স্নপনং' মানে পবিত্র হওয়া, শুদ্ধ হওয়া। ঐ শব্দতরঙ্গ প্রত্যেক প্রাণীকে, প্রত্যেক বস্তুকেও স্পর্শ মাত্রেই পবিত্র করে।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, সকলে মিলে একত্র হয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করতে থাক। কিন্তু সেই সংকীর্ত্তন সত্যি সত্যি হওয়া চাই। তাই সাধুসঙ্গ দরকার—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

এটা একটা মানসিক কসরৎ মাত্র নয়। আমরা তো উপরের অকুণ্ঠ ধামের সঙ্গে connection করার চেষ্টা করছি, যিনি কৃপা করে আমাদের সাহায্যের জন্য নেমে আসবেন। আমরা higher reality-র সঙ্গেই connection চাই, কারণ সেইটাই ত সব থেকে জরুরী। কৃষ্ণের দিব্য নাম ত একটা সাধারণ শব্দ মাত্র নয়—কেবল ঠোঁট নাড়ান মাত্র নয় ; তাঁর ত' একটা greater and higher aspect আছে—'নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়'। এর ত সবটাই spiritual—পরজগতের ব্যাপার। আমরা একটা marginal plane—তটস্থ অবস্থায় আছি। তাই higher connection নিশ্চয়ই দরকার, যাতে পরজগৎ থেকে কৃপার wave নেমে আসবে—আমাদের ভেতর বাহির সবটার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

যেখানেই হোক না কেন, কৃষ্ণসংকীর্ত্তন এই সাত প্রকার ফল দেবেই। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের এইটিই হল সারমর্ম। প্রথম effect হল—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রথমে সংসারের কামনা-বাসনা রূপ যে ময়লাগুলো আত্মাকে আচ্ছাদন করেছে, সেই ময়লাগুলোকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে। দ্বিতীয়তঃ তা মুক্তিদান করে। তৃতীয় কাজই

প্রকৃত সৌভাগ্য এনে দেয়। তা হল আত্মসম্পদের দ্বার খুলে দেওয়া। কৃষ্ণনামকীর্ত্তন আত্মার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পত্তিকে ক্রমে ক্রমে জাগিয়ে তোলে। এইখানেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্ক সূত্রগুলির প্রসঙ্গ এনেছেন। পরবর্ত্তী সোপানের কথা বলতে গিয়ে তিনি মধুররসের প্রেমভক্তির সূচনা দিয়েছেন, যাতে সাধক কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম সেবার জন্য অহেতুকভাবে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দেয়।

কৃষ্ণসঙ্গের আনন্দ ঃ

পরবর্ত্তী সোপান হল—কৃষ্ণসঙ্গরসামৃতের আস্বাদন। কৃষ্ণের ব্রজধামে যাঁরা ঠিকভাবে কৃষ্ণনাম করতে পারে, তাঁদের একপ্রকার অদ্ভুত স্বাভিমান জেগে উঠে,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।

(বিদগ্ধ মাধব ১।১২)

যখন কৃষ্ণনাম ভক্তের মুখে আবির্ভূত হয়, তখন সে পাগল হয়ে নাচতে থাকে। তার পরে, কৃষ্ণনাম এমন প্রভাব বিস্তার করে যাতে ঐ ভক্ত নিজের মুখের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। তখন সে বলতে থাকে—কেবল একটা মুখে কতইবা কৃষ্ণনাম রস আস্বাদন করব, কৃষ্ণ নামের মাধুর্য্য আস্বাদন করতে আমার লক্ষ মুখের প্রয়োজন। একটা মাত্র মুখে কৃষ্ণ নাম বলে আমার আদৌ তৃপ্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণনাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই হৃদয়ে নামের

অপ্রাকৃতত্ব অনুভূত হয়—"কেবল দুটো কান কেন? বিধির এ কি অবিচার!! আমারত লক্ষ কান দরকার! তাতে হয়ত মনে একটু তৃপ্তি পেতাম—আমি ত' লক্ষ লক্ষ কাণ চাই কৃষ্ণ নাম শুনবার জন্য!" কৃষ্ণ নামের দিকে মন গেলে ভক্তের মনের অবস্থা এই রকমই হয়! তারপরে সে মূর্চ্ছিত হয়ে যায় ; প্রেমানন্দ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে সে নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। হতাশ হয়ে আবার বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা, তার মাধুর্য্য—কিছুইত' বুঝতে পারছি না, হায় আমি কি করি?? এ নামে কত মাধুর্য্য আছে???

"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো"

—এইভাবেই নামকীর্তনকারী বিহ্বল হয়ে যায়।

কৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য ঃ

মাধুর্য্যের চরম প্রকাশ কৃষ্ণের নাম, তা ঠিকভাবে কীর্তন কর, এইটিই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শিক্ষা-উপদেশ। সেই মাধুর্য্য কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতেও আছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনির অদ্ভুত প্রভাব। সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় প্রাণীকে আকর্ষণ ও বশীভূত করার বিস্ময়কর ক্ষমতা এই বংশীধ্বনির রয়েছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে যমুনার জলের প্রবাহ স্থির হয়ে যায়, উজান বয়ে যায়, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী সকলকেই এই বংশী আকর্ষণ করে। এই বংশী গানের তরঙ্গ সব কিছুকেই স্তব্ধ করে দেয়, বিভ্রান্ত করে দেয়।

শব্দতরঙ্গ অসাধ্য সাধন করে। শব্দের ধরে রাখার ক্ষমতা অসীম। শব্দ সারতেও পারে, তারতেও পারে। তার যা ইচ্ছা করতে পারে। এর এমনই অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। Ether এর নাগালের বাইরের ঊর্দ্ধস্তরের অতি সূক্ষ্মতম স্তর থেকে তা নেমে আসে। সেই সর্ব ব্যাপক শব্দশক্তিই যাবতীয় কল্যাণ ও মাধুর্য্যের আকর। সেই

শব্দের—কৃষ্ণনামের কত শক্তি?? আমাদের কেমন করে আকর্ষণ করে?? এক টুকরো ঘাস যেমন বাতাসে যেদিকে ইচ্ছা যেতে থাকে—তেমনই নামরূপী শব্দব্রহ্ম আমাদিগকে এমন করে চালায় যে, আমরা নিজের সত্তাও খুঁজে পাই না। আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলি, কিন্তু মরে যাই না। কারণ আমরাও শাশ্বত। সেই শব্দতরঙ্গে আমরা কেবল উপর নীচু হয়ে হাবুডুবু খাই। একটা তৃণের চেয়েও আমরা অধম, আর কৃষ্ণ নামের শব্দ এত বড় এত মধুর যে তা আমাদিগকে নিজ ইচ্ছামত যেমন ইচ্ছা চালায়। কৃষ্ণনামের কত শক্তি তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। চরম কল্যাণ ও মাধুর্য্যের আকর কৃষ্ণনাম এতই শক্তি ধরে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলছেন, যে নাম নামী হতে অভিন্ন, সেই নামকে অবহেলা কর না। তা অশেষ কল্যাণও মাধুর্য্যের খনি, নামের মধ্যে সবই আছে। আর সেই নাম আমাদের কাছে খুবই সস্তায় ধরা দিয়েছে। তাঁকে ক্রয় করতে কিছুই মূল্য দিতে হয় না, কোন শারীরিক শক্তির দরকারও হয় না। এ সব নামের কাছে অনাবশ্যক। কেবল দরকার নিষ্ঠা—Sincerity।

যে সাধক নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে এই নামকে আশ্রয় করে, সে এতই ধনী হয়ে যায় যে, কেহ কল্পনাও করতে পারে না—সে কত বড় ভাগ্যবান্, কত উন্নত!! আর যে কেহ তা খুবই সস্তায় পেতে পারে, কেবল নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে সমগ্র হৃদয় দিয়ে, নামকীর্তন করা চাই—কেবল এইটুকুই দরকার। অবশ্য উপযুক্ত সাধু-গুরুর নিকটই সেই নাম গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম প্রবক্তাই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং শ্রীরাধা-গোবিন্দ মিলিততনু। তাঁর উপদেশ হচ্ছে—এই সর্ব কল্যাণপ্রদ ও চিত্তশুদ্ধিকারক শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনকে আন্তরিক নিষ্ঠা ও নৈরন্তর্য্যসহ আশ্রয় কর—যে নাম

আমাদের মুক্তি দান করবে, যাবতীয় বাসনার নিবৃত্তি করবে এবং এমন সার্থকতা এনে দেবে যা দ্বারা আমরা সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য রসসাগরে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জন করতে পারব।

এইটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্বোত্তম কৃপা। আর তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন সমগ্র জগতে প্রসারিত হোক যাতে করে সমগ্র জীবজগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করে ধন্য হবে। কারণ এর দ্বারাই যাবতীয় দুঃখের নিবৃত্তি হবে, আর এইটিই জীবের চরম সার্থকতা।

এই কলিযুগে কেবল নামসংকীর্ত্তনই আমাদের সাহায্য করতে পারে। নাম সংকীর্ত্তন সব যুগের জন্যই কল্যাণপ্রদ। তা হলেও কলিযুগের জন্য নামসংকীর্ত্তনের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী। তার কারণ এই যুগে অন্য সব সাধন ব্যবস্থায় বাধা অনেক বেশী, কিন্তু জগতের কোন বাধাই নামসংকীর্ত্তনের প্রভাবকে ব্যাহত করতে পারে না। অতএব নামসংকীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র সাধন। যদি আমরা ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে এই নামসংকীর্ত্তন পন্থাকেই আশ্রয় করি, তবে আমাদের জীবনের সব কিছুই পাওয়া হয়ে যাবে। অন্য কোন সাধনপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন নাই ; কারণ সে সবই ত্রুটিপূর্ণ ও আংশিক ফল প্রদান করে। কিন্তু নামসংকীর্ত্তন জগতের সকলের জন্য সর্বাপেক্ষা সহজ অথচ সর্বোচ্চ ফল প্রদান করে। এর দ্বারা সকলেই পরম শান্তি লাভ করতে পারে।

যে সব জীবাত্মা, এখন কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে, তাদের সকলেরই এই নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা চরম কল্যাণ লাভ হবে। অন্য কোন প্রকার আন্দোলনের দরকারই নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, তোমরা সর্বতোভাবে এই নামকীর্ত্তনকেই আশ্রয় কর। এতেই সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। আর তোমরা সামান্য পরিশ্রমে অনায়াসে তা লাভ করবে। কলিযুগে নামসংকীর্তনেরই জয় হোক। এর দ্বারাই সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে। সারা জীবজগৎ এর দ্বারাই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে উপসংহারে শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে—

নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।

পাপ বলতে সকল অনর্থ সকল অবাঞ্ছিত বস্তু, অপরাধ। জাগতিক সুখসম্ভোগ আর মুক্তি এ দুটোই অনর্থ, পাপ মধ্যে গণ্য। মুক্তিকেও পাপ ব'লে কেন বলা হয়েছে? কারণ সেও একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের স্বাভাবিক নৈসর্গিক কাজ হল কৃষ্ণসেবা। মুক্তিতে ত' আমরা সেবা করতে পারি না। কেবল মুক্তিটাই ত' সেবা নয়। তাই মুক্তিটাও অস্বাভাবিক বলে পাপ। আমাদের স্বাভাবিক কাজ বাদ দিয়ে তা থেকে দূরে থাকাই ত' পাপ।

শ্রীব্যাসের মহাবদান্যতা ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষশ্লোকে বলা হয়েছে,—"কৃষ্ণের পবিত্র নাম আমাদের সর্বপ্রকার পাপ, অনর্থ থেকে, সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত করে। এস আমরা তাঁকেই প্রণাম করি।" —এই বলেই সেই মহান্ গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত নীরব হন। শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ শব্দ 'নামসংকীর্ত্তন'। ভাগবত কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইখান থেকেই তাঁর অভিবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বেদসমূহের বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁর সর্বশেষ কৃতি শ্রীমদ্ভাগবতে আস্তিকতাকে এই স্তর পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন এবং তারস্বরে জগদ্বাসীকে আহ্বান করে বলেছেন, "কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন কর। এইটাই কর, আর কিছুরই দরকার নাই"। শ্রীমদ্ভাগবতের এইটিই সর্বশেষ উপসংহার বাক্য—ব্যাসদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক দান—'কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর' এবং এই কলিযুগের সর্বোত্তম উদার পরমার্থপথ—'কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন'।

অমৃত-ধারার অমৃত ঃ

আমরা নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ বলে মনে করি, কারণ আমরা এই রকম একটি মহা উদার ও প্রয়োজনীয় সংকল্প গ্রহণ করেছি, তাঁর অত্যন্ত নিকটেই এসেছি, তাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেয়েছি, তাঁকে আপন করে নিয়েছি এবং তার করুণাধারায় নিজেকে সাধ্যমত ভাসিয়ে নিয়েছি। অনেক জন্মের অনেক সুখ-সম্ভোগ লাভ করেছি, সে সব ছেড়ে দিয়ে এখন নামসংকীর্ত্তনের রসাম্বুধির কিনারায় এসে পড়েছি। এখন আমরা গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এই নামসংকীর্ত্তন-রসামৃতের তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার দেওয়া আরম্ভ করি।

এ সব তাঁদের সম্পদ, আর আমরা তাঁদের দাস। তাই আমাদের এত সাহস যে, আমরা সেই নামকীর্ত্তনের অমৃতসাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছি, তাতে সাঁতার কাটছি। কোন ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ডে— পরমার্থলাভের শেষ পর্য্যায়ে অবগাহন করা! এও সম্ভব নাম-সংকীর্ত্তনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তনরসসাগরের positive side-টাই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে তার negative possibilities দেখান হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিক্ষাষ্টকের সংস্কৃতটীকা রচনা করে, তার বাঙ্গলা অনুবাদও নিজে লিখেছেন, এবং সেই টীকাই সবচেয়ে original representation। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদও শিক্ষাষ্টকের একটি টীকা লিখেছেন। এই সব তত্ত্ব ভালভাবে বুঝবার জন্য সেই টীকাগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। আমি আমার হৃদয়ে যতটুকু অনুভব করেছি, সেইটুকুই এখানে প্রকাশ করছি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা থেকে আমার মনে যা এসেছে তাই প্রকাশ করছি। তাঁদের করুণায় তা আমার ভাণ্ডারে গচ্ছিত আছে ; তারই সারমর্ম আমি পরিবেশন করছি।

কৃষ্ণচেতনা সর্ববিজয়ী ঃ

ভক্তির পথ আশ্রয় করলে আমাদের অন্তরাত্মার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে এবং ক্রমশঃ জড়জগতের যাবতীয় charm—প্রলোভন দূর হতে থাকে। ভেতরে একরকম সংগ্রাম চলতে থাকে এবং কৃষ্ণচেতনা যখন সাধকের চিত্তকে গ্রাস করে ফেলে, তখন আর যা কিছু চিন্তা ও ধারণা সবই চলে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে,—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।। (ভাঃ ২।৮।৫)

শরৎকাল এলেই জলের কাদাগুলো আপনিই তলায় পড়ে যায়, জল নির্মল হয়ে যায়। যখন কৃষ্ণচেতনা হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আর সব কামনা-বাসনা, জানা-অজানা, সব চিন্তাধারা আপনা হতেই ক্রমশঃ মন থেকে সরে যায়, কৃষ্ণচিন্তাই হৃদয়টাকে পুরোপুরি অধিকার করে। কৃষ্ণের একবিন্দু কৃপা মন থেকে, হৃদয় থেকে সবকিছুকেই সরিয়ে নিজেই ভক্তের হৃদয় দখল করে।

এইটাই কৃষ্ণচেতনার স্বভাব। কোন কিছুই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। সে তথাকথিত দেব-দেবী পূজাই হোক অথবা খৃষ্টান্, ইস্‌লামধর্মধারণাই হোক—সবই মন থেকে চলে যায়। আস্তিকতার আর যত সব চিন্তা-চেতনা আছে, সবই কৃষ্ণচেতনার কাছে হার মেনে পালিয়ে যায়। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কাছে কেউই দাঁড়াতে পারে না।

সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও চমৎকারিতা সব শক্তিকেই হার মানায়—বশ করে ফেলে। আমরা ত' বাস্তবিকই কেবল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, করুণা, ও প্রেমের পিয়াসী। আত্মস্বার্থ-ত্যাগের মধ্যে এমন বল ও ঔদার্য্য রয়েছে, তা সব কিছুর উপরেই জয়লাভ করে—সব অভাবকেই পূরণ করে নেয়। পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতেই যে বেশী

লাভ! অপ্রাকৃত প্রেম মানেই বাঁচার জন্য মরা, নিজের জন্য বাঁচা নয়, পরের জন্য বাঁচা। চরম ত্যাগ, চরম উৎসর্গ কেবল কৃষ্ণচেতনার মধ্যেই সম্ভব।

কৃষ্ণচেতনার মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য আছে, যার হৃদয়ে তার আবির্ভাব হয়, সে নিজের পরিচয় এমন কি নিজের সত্ত্বাও হারিয়ে ফেলে। সে পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়, এমনই তার চমৎকারিতা। কে ই বা কৃষ্ণের কাছে দাঁড়ায়? যে ভাবনাই আসুক, তার কাছে সবই নিরস্ত্র হয়ে যায়। যদি কোনও প্রকারে কৃষ্ণ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, তা হলে আর কোন কিছুই সেখানে স্থান পায় না। সবই কৃষ্ণের অধিকারে এসে যায়। কৃষ্ণ এমনই উদার, এমনই সুন্দর, এমনই মধুর, এমনই সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ!

শ্রীনাম-সাধনে অযোগ্যতা উপলব্ধি

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।। ২ ।।

অনুবাদ ঃ

হে ভগবান্! আপনার পবিত্র নাম সকলের উপর কল্যাণ বর্ষণ করে। আর আপনার কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি অসংখ্য নাম আছে যার মাধ্যমে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

আপনি দয়া করে নিজের সর্বশক্তি ঐ নামের মধ্যেই নিহিত করেছেন। আর ঐ নামকীর্ত্তনে স্থান ও কালের কোন নিয়ম রাখেন নাই।

আপনি অহৈতুকী কৃপা করে নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব, সেই নামে আমার কোন অনুরাগ হল না।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, হে প্রভো! আপনি অপ্রাকৃত দিব্য নাম-সংকীর্ত্তন প্রকাশ করেছেন এবং ঐ নামের মধ্যেই নিজের সমগ্র ভগবত্তা নিহিত করেছেন। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম উভয়েই সমান শক্তিমান্। কৃষ্ণের নামের মধ্যেই কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে আর ঐ নামকীর্ত্তনের জন্য কোন বিশেষ স্থান বা সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এমন নয় যে কেবল প্রাতঃকালে বা স্নানাদি করে বা তীর্থস্থান বা মন্দিরাদিতে গিয়ে নাম কীর্ত্তন করতে হবে—এ প্রকার কোন

বিধি-নিষেধ নাই। যে কোন অবস্থায়, যে কোনও সময়, যে কোন স্থানে নামকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি ত' সকলকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুযোগই দিয়েছো। তুমি এতই দয়াময় যে তুমি তোমার নাম-কীর্ত্তন সেবার সুযোগ দিয়েছো ; কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগা যে, তোমার নামকীর্ত্তনে আমার এখনও আন্তরিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হল না। আমার কোনও শ্রদ্ধা নাই, প্রেম নাই কোন আগ্রহও হচ্ছে না তোমার নামকীর্ত্তনের জন্য! আমার অন্তরে সে আকুল প্রার্থনা কোথায়? আমি এখন কি করি?

এইটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক। তিনি বলেন, হে প্রভো! তুমিত' তোমার দিক্ থেকে সবই দিয়েছ আমাকে এই সংসার থেকে তুলে নেওয়ার জন্য! আমাকে উদ্ধার করার জন্য তোমার উদারতা ও উৎকণ্ঠা এমনই যে, তোমার কৃপা গ্রহণের জন্য আমার দিক্ থেকে কেবল একটু উৎকণ্ঠা, একটু সহযোগ মাত্র চাইছ। কিন্তু আমি তোমার সেই কৃপার আহ্বানে কোন সাড়াই দিতে পারছি না, হে প্রভো! আমি যে গেলাম!!

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই আমাদের একটা বিরাট আশার আলোক দেখিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—কৃষ্ণনাম ঠিকভাবে কীর্ত্তন করলে পর পর সাতপ্রকার ফল দিতে থাকে। প্রথম ফল চিত্তের বিশুদ্ধি, দ্বিতীয় ফল সংসার থেকে মুক্তি। তৃতীয় ফল হল হৃদয়ে আত্মস্বরূপ জাগ্রত করে সাধককে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়া। তার পরে স্বরূপশক্তি যোগমায়ার নিয়ামকত্বে 'বধূ' ভাবের উদয় হয়। আমরা পরাশক্তি যোগমায়ার অনুপ্রকাশ ; কৃষ্ণের সেবাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। 'বধূ' শব্দের দ্বারা সেই মাধুর্য্যরসকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, যে রসে কৃষ্ণের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরের connection হয়ে থাকে।

প্রেমানন্দ-সাগর ঃ

সেই stage-এ যাওয়ার পর আর কি কি অবস্থা আসে? সাধক ত' আনন্দসাগরের একটি কণা হয়ে যায় ; আর সেই আনন্দ ত' যা তা নয়, সেইখানেই থেমে যায় না। তা ত' দিনে দিনে নিত্য নূতন হয়ে প্রকাশিত হয় এবং সাধককে পরিপূর্ণ শুদ্ধস্বরূপে নিয়ে যায়। যদিও বাহ্য স্থিতিতে আমাদের কিছুটা ব্যক্তিগত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, তথাপি নামকীর্ত্তনের সময় আমাদের সত্তা যে পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—এ অনুভব নামকীর্ত্তনকারী এবং তাঁর সহযোগী সকলেরই হয়ে থাকে। সকলেই শুদ্ধ সত্ত্বে রূপান্তরিত হন। নাম-সংকীর্ত্তনের এই সাতপ্রকার ফল আমরা পাই।

প্রথম শ্লোকে শ্রীমন্নহাপ্রভু এই thesis প্রতিপাদন করার পর পরবর্ত্তী শ্লোকে তার antithesis দেখাতে চেয়েছেন। যখন শ্রীনামসংকীর্ত্তনের এত সুফল—এত আশাবন্ধ ব্যক্ত করা হয়েছে, তখন আমরা আর এত কষ্ট স্বীকার করি কেন? কৃষ্ণের কাছ থেকে ত' অপার করুণা ঝরে আসছে ; তিনি ত' না জানি কতই সুযোগ আমাদের জন্য করে দিয়েছেন! আমাদের দিক্ থেকে সামান্য একটু আগ্রহ ও ইচ্ছামাত্র চেয়েছেন। আমাদের কিছুটা উদ্‌যোগ দরকার নাম নেওয়ার জন্য।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, আমাদের সেটুকুও নাই। সুতরাং আমরা কি আশাভরসাই করতে পারি? কি করে তা পাব। হয়ত বাহিরের দিক থেকে দেখতে নামকীর্ত্তন করি, কিন্তু তা অন্তর থেকে হয় না। তাই কোন্ পন্থায় নাম নিলে আমরা নামকীর্ত্তনের ফল পাই, সাধনপথেও এগোতে পারি? শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটিই তার উত্তর।

কেহ হয়ত অনুভব করে যে তার grant পাওয়ার জন্য

minimum deposit নাই, তবুও হতাশার কোন কারণ দেখি না। কারণ এই প্রকার অনুভবই ত conception of humility—যখন কোন সাধক ভগবানের প্রতি ভক্তি করতে আরম্ভ করে, সে ত' নিজেকে ভগবানের তুলনায় অতি নগন্য বলেই অনুভব করে ; কারণ ভগবান্ অসীম, অনন্ত, আর সাধক জীব ত' একটি কণা অণু মাত্র। সে তখন চিন্তা করে—আমার ত' দেওয়ার মত কিছুই নাই। এমন কি প্রভুর কৃপালাভের ন্যূনতম যোগ্যতাও আমার নাই। আমার কোন গুণ নাই, আমি একেবারেই রিক্ত।

ভক্ত কেবল নিজেকে ভগবৎ কৃপালাভের অযোগ্য বলেই মনে করে না, সে জানে যে, সে একেবারে ঘৃণ্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।"

কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের সামান্যতম যোগ্যতা নাই বলে আমাদের হতাশ বা নিরুৎসাহিত হবার কোন কারণ নাই। কারণ এইপ্রকার দৈন্যবোধ ত' শুদ্ধভক্ত মাত্রেরই স্বভাবগত। আর যুগপৎ আমাদের নিজ ভক্তিভাব সম্পর্কে একটা আন্তরিকতাহীন ধারণা করাও উচিত নয়। কৃষ্ণের জন্য আমার এতটুকুও ভালবাসা নাই, স্পৃহা নাই—এ প্রকার চিন্তাত ঠিকই। কিন্তু আমার কিছু ভক্তি আছে, কিছু আগ্রহ আছে কৃষ্ণসেবার জন্য—এ প্রকার চিন্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমরা যখন অনন্ত, অসীমের সঙ্গে connection চাই, তখন আমাদের একেবারে শূন্য হতে হবে। আমাদের নিজত্ববোধ পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে। জাগতিক উন্নতি ত' ভক্তিবিরোধী তত্ত্ব। তাই আমাদের জাগতিক উন্নতিকামনা থেকে একেবারেই দূরে থাকতে হবে। আমাদের চিন্তা এই প্রকার হবে—আমি ত' কিছুই নই। কৃষ্ণের

সেবা পাবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নাই। আমি একেবারে অযোগ্য। জড় 'অহং' ভাব থেকে আমাদের পুরোপুরি সরে আসতে হবে এবং নিজেকে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার কাছে সমর্পণ করতে হবে। দাসের আবার position কি? সমস্ত পদবী—whole position ত' প্রভুরই, সবই ত' তাঁর! এই প্রকার অনুভূতিই সেবা পাওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা থাকে যে আমাদের কিছু যোগ্যতা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই যত গোলমাল, যত বাধা। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই বলেন, "ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ"—কৃষ্ণেতে এতটুকু প্রেমও আমার নাই। এইটাই বিনয়ের, দৈন্যের মাপকাঠি। আর এই ভাবনা আন্তরিক হওয়া চাই। কেবল অনুকরণ মাত্র নয়। আমাদের খুবই সাবধান হওয়া চাই। সর্বোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠের কেবল অনুকরণ করার দুঃসাহস যেন না হয়। আন্তরিকতা সহ সত্যি সত্যি অনুভব করা চাই যে আমার কিছুই নাই, আমি নিষ্কিঞ্চন এবং নামকীর্ত্তনের জন্য এইটিই সর্বোত্তম যোগ্যতা।

শ্রীনাম-গ্রহণ-পন্থা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। ৩।।

অনুবাদ ঃ

যে সাধক তৃণ হতেও সুনীচ, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু, যে অপরকে যথাযথ সম্মান দেয়, কিন্তু নিজে কারও কাছ থেকে সম্মান চায় না, সেই-ই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

আমাদের মুখ্যতঃ এই মনোভাব নিয়েই থাকতে হবে যে, আমরা অধম হতেও অধম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন যে, একটি ঘাস পাতারও কিছু মূল্য আছে, কিন্তু আমার সেটুকু মূল্যও নাই। আমাদের কোন positive value নাই। একজন অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু একজন পাগল তার চেয়েও খারাপ। পাগল হয়ত চিন্তা করতে পারে, কিন্তু তা ত' abnormal। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, আমার যদিও কিছুটা চেতনাশক্তি আছে, কিছুটা বুদ্ধিও আছে, কিন্তু তা সবই misdirected—ভুল পথেই চল্‌ছে। একটা ঘাসের পাতা ভুল দিকে যাওয়ার উপায় নেই। যদি কেহ তাকে মাড়িয়ে যায়, তবুও তার উল্‌টে গিয়ে ফুঁড়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি নাই। ঝোড়ো হাওয়াতে বা বাহ্য পরিবেশে শুকনো ঘাস এদিক ওদিক যেতে থাকে ; কিন্তু আমি ত' সব সময় কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে যেতে চাই না। যদি পরিবেশের চাপে আমাকে কোন একটা দিকে যেতে বলা হয়, আমিও তৎক্ষণাৎ তার বিরোধিতা করি। যদি

তুমি প্রকৃতই আমার যোগ্যতা বিচার কর, তবে আমি ত' তৃণ থেকেও অধম—এই জন্য যে আমার বিরোধ করার প্রবৃত্তি রয়েছে।

যখন আমরা অসীম বস্তুর চরম কল্যাণের আধারের সহিত নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই, তখন আমাদের এই প্রকার চিন্তা করা উচিত,—আমার কোনও মূল্য নাই। বরং যা আছে তা ত' আসলের বিপরীত! প্রভুর কৃপার বিরোধাচরণ করা ত' আমার স্বভাব! যদি কৃষ্ণ কৃপা করতে আসেন, তখন আমি তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করি। আমার গঠনই এমনি যে, আমি আধ্যাত্মিক আত্মহত্যাই করি। কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করতে এগিয়ে এলে আমি প্রতিরোধ করি, তাই আমার মধ্যে যে শক্তিটুকু আছে তা ত' আমাকে আত্মহত্যা করতেই ঠেলতে থাকে। এই রকমই আমার অবস্থা। কিন্তু তৃণ—সে কাউকে প্রতিরোধ করে না। আমার কিন্তু সেই স্বভাবই রয়েছে। আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে আমাদের দুর্ভাগ্য এমনই। এই রকম পরিস্থিতিতে নামপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণই ত' একমাত্র উপায়।

এ পথটি যে একেবারেই সহজ সরল, এও ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। বাইরের দিক্ থেকে কত বাধা বিঘ্ন আসতে পারে। ভক্তরা যখন রাস্তায় কীর্ত্তন করে করে চলে, তখন কত লোক এসে বলতে পারে—এই যে বানরগুলো—লালমুখো বানরগুলো! এই রকম কত বাধা, কত অসুবিধা, কত প্রতিরোধ এসে আমাদিগকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে, তাই আমাদের বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হতে হবে। এই গাছের উদাহরণ কেন দেওয়া হয়েছে জানেন? তা এইভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—যদি কেউ গাছে জল না দেয়, তবে গাছ তাতে কিছুই বলে না। যদি কেউ এসে গাছের পাতা ছিঁড়ে, ডাল কাটতে থাকে, এমন কি গোটা গাছটাকেই কেটে সাবাড় করতে আরম্ভ করে গাছ তবুও কিছুই বাধা দেয় না। সেই রকম আমাদেরও ভেবে দেখা দরকার, অপমান, নিন্দা, দারিদ্র্য, শাস্তি বা অন্যান্য

প্রতিকূলব্যবহার গুলিও কিভাবে আমাদের চিত্ত-শুদ্ধি করতে সাহায্য করে—সামান্য শাস্তিতেই আমরা কিভাবে জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করি।

কৃষ্ণচেতনার মাধ্যমে আমরা জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি—যা আমাদের অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তার জন্য আমরা কি মূল্য দিতে পারব? তাও ত' ভেবে পারা যায় না। যদি তার জন্য কিছু সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা আমরা হাসিমুখে কেন করব না! যদি আমাদের সত্যিই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে, উন্নত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত আশাভরসা পাই, তবে পরিস্থিতি আমাদের কাছ থেকে কিছু দাবী করলে আমাদের তা দিতে প্রস্তুত থাকতেই হবে।

কৃষ্ণ! তোমাকে সাজা দেবই। দাঁড়াও!

এক সময় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপ শহরে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। পাড়ার লোকেরা ত' অনেক সময় বাবাজী ভিক্ষাজীবিদের নানারকম অপমান করতেন, আক্রমণও করতেন। এমনকি তারা শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মত মহাপুরুষকেও বাদ দিতেন না। একদিন রাস্তার ছেলেরা বাবাজী মহারাজের উপর ময়লা ফেলে দিল, ইটপাটকেল ছুঁড়ল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ খুবই রেগে গিয়ে কৃষ্ণকেই শাসাতে আরম্ভ করলেন—"কৃষ্ণ! তুমি শুধুশুধু আমাকে এত হয়রান করছো! দাঁড়াও, মা যশোদার কাছে সবই বলে দেব।"

এই রকমই ছিল তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং এই ভাবেই তিনি সবটাকেই সামলে নিতেন। আমাদের প্রতি যা লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার আসে সবটাতেই কৃষ্ণের ইচ্ছা বলে জানতে হবে। আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে এটা খুবই বাস্তব যে ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। তবে ভক্তের বিচার আরও গভীর, আরও রহস্যঘন। সে ত' ভাবে—"কৃষ্ণ! তুমিই তাহলে এ ছেলেগুলোকে আমার পেছনে লাগিয়েছ, আমাকে বিরক্ত করছ! দাঁড়াও, তোমায় কি করে জব্দ করতে হয়, তা আমি জানি। সোজা গিয়ে মা যশোমতীকে বলে দেবো, তোমাকে আচ্ছা করে শাসন করে দেবেন।"

উন্নত স্তরের ভক্ত জানে—সবই কৃষ্ণের ইঙ্গিতে হচ্ছে। যা কিছু ঘটছে, তার পেছনে কৃষ্ণেরই হাত। এই ভাবেই ভক্তরা সব কিছুই গ্রহণ করে এবং এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের পথ দেখায়। আপাতত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই বিচারই আমাদের সাহায্য করে। এতে একটা মধুর সমন্বয় আছে। সেইজন্য বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমাদের কোন ত্রুটি না থাকলেও প্রতিকূল পরিস্থিতি আসবেই এবং তা আমরা সহ্য করব।

সেইসঙ্গে আমাদের অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পাওয়ার লোভই ভক্তের সবচেয়ে বড় শত্রু। গর্ব বা অহংকারই কৃষ্ণভক্তের মুখ্য শত্রু। আর এই অহংকারই শেষে মায়াবাদীর সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। তারাই বলে "আমি সেই, সো অহম্"—not দাসোহহম্। আমিইত সেই পরতত্ত্ব পরমাত্মা—I am that, I am He। তারা এ কথাটা ভুলে যায়, জীব বা আমি ত' একটা সূক্ষ্মতম অণু মাত্র—জন্ম মৃত্যুর নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছি। এই সব বাস্তব সত্য কথা মায়াবাদীরা ভুলেই যায়। এই রকম Ego, Position—প্রতিষ্ঠাই আমাদের বড় শত্রু। এই শ্লোকে প্রতিষ্ঠা বা position সম্পর্কে একটা বিশেষ চিন্তাধারার উপদেশ ব্যক্ত করা হয়েছে।

কৃষ্ণের দাস্য-ভূমিকা ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, তুমি কারও কাছ থেকে কোন সম্মান

আশা ত' করবেই না, বরং অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিবে। অপরকে সম্মান দিও, কিন্তু কারো কাছ থেকে চেয়ো না। অহংকারই আমাদের গুপ্ত শত্রু, এই গুপ্ত শত্রুকে যদি কোন প্রকারে জয় করতে পারি তবেই কৃষ্ণের দাস্য ভূমিকায় যেতে পারি এবং যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণের সেবা করছেন, তাঁদের গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারি। ঐ শ্লোকের সাধারণ অর্থ হল—"কখনও প্রতিষ্ঠা বা সম্মান কারো কাছ থেকে চেয়ো না, তার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই যথাযোগ্য মর্য্যাদা বা সম্মান দিও।"

একটি সাংঘাতিক অপমান ঃ

আমাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথমের দিকে একটি মোটরগাড়ী চড়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। যে যুগে কোন সাধুকে এভাবে মোটরে করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা কেউ শুনে নাই। একদিন একজন পূজক-ব্রাহ্মণ আমাদের পরমপূজ্য মহাভাগবত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মত কিছু বলে ছিল। তার দম্ভোক্তি ছিল, "আমরা কেবল শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী নই, আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশে জাত। তাই আমাদের শ্রীল দাস গোস্বামীকে আশীর্বাদ দেওয়ার অধিকার আছে। কারণ তিনি ত' নীচ কূলে জন্মেছিলেন এবং তিনি নিজেই আমাদের আশীর্বাদ চাইতেন।"

অবশ্য দাস গোস্বামী প্রভুর দৈন্য অপরিসীম। তিনি দৈন্যার্ত্তি নিবেদন করে প্রার্থনা করেছিলেন—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বমতিতরা
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।।

"হে মন, আমার ভাই! আমি তোমার পায়ে ধরে প্রার্থনা জানাই, সর্বপ্রকার গর্ব অভিমান ত্যাগ কর এবং সর্বদা ব্রজপ্রেম আস্বাদন কর, আর তার সঙ্গে গুরু, ব্রজধাম, ব্রজের কৃষ্ণপ্রেমিক গোপ-গোপীবৃন্দ, ভূদেব পবিত্র ব্রাহ্মণগণ, গায়ত্রীমন্ত্র, গুরুদত্ত কৃষ্ণনাম এবং ব্রজের যুগলমূর্ত্তি শ্রীরাধা-গোবিন্দসুন্দর এঁদের প্রতি হৃদয়ে অপূর্ব প্রেমভক্তি ধারণ কর।"

সেই পুরোহিত বললেন, "আমরা শ্রীধাম-বৃন্দাবনের অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণ ; সুতরাং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আশীর্বাদ দেওয়ার অধিকার ত' আমাদের নিশ্চয়ই আছে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তখন রাধাকুণ্ডে ছিলেন। তিনি তাঁর এইসব যুক্তি শুনে অনশন আরম্ভ করলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমাকে এও শুনতে হল! এই ব্রাহ্মণ এতই দাম্ভিক, ক্রোধী, অথচ সে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে, যিনি আমাদের অত্যন্ত পূজ্য সর্বমান্য পূর্বগুরুবর্গের অন্যতম পরম বৈষ্ণবাচার্য্য, তাঁকেও আশীর্বাদ দেওয়ার স্পর্দ্ধা রাখে আর আমাকে তা সহ্য করতে হচ্ছে।" এই বলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে কোন কিছু না বলে নিজেই অনশন শুরু করলেন। আমরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম সকলেই তাঁর সঙ্গে অনশন আরম্ভ করলাম। স্থানীয় একজন ব্রজবাসী ভদ্রব্যক্তি যখন শুনলেন যে, আমরা সকলেই উপবাসী রয়েছি, তখন তিনি সেই উদ্ধত ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে ধরে এনে গুরুমহারাজের নিকট ক্ষমা চাওয়ালেন। প্রভুপাদ এতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। সেই সময় সমবেত ভদ্র ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে একজন শ্রীল প্রভুপাদকে বললেন, "ওরা ত' একেবারেই অজ্ঞ, ওদের কথায় এতটা বিচলিত না হয়ে ওদেরকে আপনার ignore (অগ্রাহ্য) করাই ভাল।" তাতে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "আমি যদি কেবল একজন সাধারণ বাবাজী হতাম তবে ওর ঐ কথা শুনে কান বন্ধ করে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতাম। কিন্তু আমি ত' একজন বৈষ্ণবাচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ

করেছি। আমাকে ত' নিজে আচরণ করেই অপরকে শিক্ষা দিতে হবে। আমার গুরুদেবকে ঐভাবে অপমান করলে আমি যদি নীরবে চলে যাই তবে মোটরকার চড়ে ভ্রমণ করার আমার কি অধিকার আছে?"

তিনি এই কথাটাকে বার বার বলতে লাগলেন—"আমি মোটর গাড়ী করে বৃন্দাবন ধামে এসেছি কেন? আমি যদি একজন বৈরাগী নিষ্কিঞ্চন ভজনকারী হতাম তবে ত' নির্জনে কৌপীন পরে থাকতাম। ঐ ব্যক্তির কথায় কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে কেবল স্থান ত্যাগ করে চলে যেতাম। কিন্তু আমি যখন আচার্য্যের আসনে বসে মোটর গাড়ীতে ঘুরছি, আমাকে শিক্ষা দিতেই হবে—আমার গুরুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যা দরকার, যা আমার দ্বারা সম্ভব, তা করতেই হবে। আমি এই দায়িত্বই ত' নিয়েছি, তা এড়িয়ে যাই কি করে? আমাকে সাধ্যমত এমন কিছু করতে হবে, যাতে করে এই ব্যাপার অজ্ঞাতসারে এবং বিনা প্রতিরোধে চলতে না পারে।"

দৈন্যগুণের যথার্থ ও বাস্তবানুযায়ী আচরণ করা চাই। একসময় হরেকৃষ্ণমন্দির আক্রান্ত হওয়াতে ভক্তরা মন্দির রক্ষার জন্য বন্দুক চালিয়েছিল। তারপরে স্থানীয় ব্যক্তিগণ অভিযোগ করল—দেখ হে! এরা নাকি বিনয়ী, সহিষ্ণু বৈষ্ণব? এরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচ', 'বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু' উপদেশ লঙ্ঘন করে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে! এই রকম কত অভিযোগ আমার কাছে এল। আমি কিন্তু বৈষ্ণবদের এ' ব্যাপারকে সমর্থন করে বললাম— "না, তারা ঠিকই করেছে। তৃণাদপি সুনীচ ভক্তের কাছে হতে হবে, পাগলের কাছে নয়।"

সাধারণ মানুষ অজ্ঞ। তারা ত' এক প্রকার পাগল। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তারা ত' ঠিক বুঝতে পারে না। সুতরাং তাদের

বিচারের কোন মূল্যই নাই। ভক্তরা অমানী এবং মানদ কিনা, তা বিচার করার অধিকারী কারা? যারা পাগল? যারা অজ্ঞ? তাদের কি যোগ্যতা আছে বিচার করার কে বিনয়ী, কে নম্র, কে অমানী, কে মানদ? দৈন্য-বিনয় বিচার করার ত' কিছু মাপকাঠি আছে! উন্নত বিচারবন্ত যাঁরা, তাঁরা যে মাপকাঠি ঠিক করেছেন, তাই দিয়েই আমরা ঐ কথা বিচার করব—অজ্ঞ জনসাধারণের মাপকাঠিতে নয়।

কার্পণ্য বা বিনয়ের মানদণ্ড ঃ

হয়ত কেহ-বাহ্যিক কপট দৈন্য-বিনয় দেখিয়ে সাধারণ জন-সমাজকে প্রতারিত করতে পারে। কিন্তু দৈন্যের ভান প্রকৃত দৈন্য নয়। দৈন্য হৃদয় থেকে আসা চাই এবং তার উদ্দেশ্যও মহৎ হওয়া চাই। বিনয়, সহনশীলতা, অহংকারশূন্যতা প্রভৃতি প্রকৃত সচেতন সাধু ব্যক্তির মানদণ্ডেই বিচার্য্য ; হাতী, বাঘ, শিয়াল প্রভৃতির মত কতকগুলো মূর্খব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ডে তা হতে পারে না। দৈন্য কি, তার বিচার কি ঐ লোকগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়া যায়? এমন দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য?—কখনই নয়। ভক্ত কি কখনও চিন্তা করতে পারেন—বিগ্রহ ও মন্দির অপবিত্র হতে যাচ্ছে যখন, তখন আমি পাশে দাঁড়িয়ে কেবল দেখব, কিছুই করব না। আমি বিনয়ী হব ও সহ্য করব? কুকুরটা মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছে, আর আমি তাকে সম্মান দেখাব?—না, এ কখনও প্রকৃত বিনয় হতে পারে না।

বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে, আমাদের একটা সমুচিত অবধারণা থাকা প্রয়োজন। অপরকে সম্মান দেওয়ার নামে আমরা এই সব বিকৃত ব্যবহার আর বিচার ধারার সঙ্গে গোঁজামিল দেওয়া প্রশ্রয় দিতে পারি না। বিগ্রহ বা মন্দিরকে বা ভক্তগণকে অপবিত্র করা বা ক্ষতি করার বিচারকে সহিষ্ণুতা বা দৈন্যের ছলে প্রশ্রয় দেবো না—কুকুরকে মন্দিরে ঢুকতে দেবো না। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যের স্থূল

আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করে তার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন।

'আমি তৃণাধম' কথাটার অর্থই হল, "আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস"। এই প্রকার বিচারকে অবলম্বন করে আমরা সাধনপথে এগিয়ে চলব। যদি কেহ আমার প্রভুকে অপমান করতে আসে তখন আমি বরং নিজেকেই উৎসর্গ করব এই বিচারে যে, আমি অতি নগণ্য, আমার জীবন দেওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমার প্রভুর মর্য্যাদা রক্ষা করবই—ভক্তের জন্য, ইষ্টদেবের জন্য, তাঁদের সবার জন্য—জীবন তাতে থাক আর নাই থাক।

আমাদের ঠিকভাবে বুঝা দরকার—কাঁকে সম্মান দিতে হবে। সর্বোচ্চ সত্যস্বরূপ, ঈশ্বরেরও ঈশ্বর যিনি, তাঁকেই আমরা সম্মান দেবো এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপরের সঙ্গে ব্যবহার করব অর্থাৎ—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। সর্বোচ্চ পরতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে যখনই আমাদের উপলব্ধি হবে, তখনই বুঝতে পারব, আমরা কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। তাই যখন আমাদের গুরুবর্গের প্রতি অত্যাচার বা অবমাননা দেখব তখন আমাদের ঐ ক্ষুদ্র সত্তাটুকু উৎসর্গ করবই। সুতরাং যখন দৈন্যের কথা উঠবে, তখন এই সব কথা বিচার করতে হবে। দৈন্যত কেবল একটা শারীরিক স্থূল অনুকরণ মাত্র নয়। তা অন্তর থেকে আসা চাই। এটা ত বাস্তব অনুভূতির কথা। প্রতিষ্ঠা বা সম্মান কেবল ভগবান্ ও ভক্তগণেরই প্রাপ্য, আর কারও নয়।

ভক্তির সর্বোচ্চস্তরে যাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন অর্থাৎ যাঁরা পরমহংস বাবাজী, যারা সাংসারিক যাবতীয় সংসর্গ ত্যাগ করে নিষ্কিঞ্চন জীবন যাপন করছেন, তাঁদের বেলায় দৈন্য জিনিষটার বিচার আলাদা। কিন্তু মধ্যম অধিকারী প্রচারকের বিচার স্বতন্ত্র। শ্রীল প্রভুপাদ যেমন বললেন, "আমি যদি একজন নিষ্কিঞ্চন বাবাজী হয়ে নির্জনে একান্ত

ভজনকারী হতাম, তবে ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতাম। কিন্তু যখন আমরা প্রচার করছি, লক্ষ লোককে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব বহন করছি, আমাদের বিচার ও আচারের যথার্থ প্রয়োগ হওয়া দরকার। সাধারণত যারা আমাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধভাবাপন্ন, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে যেতে পারি ; কিন্তু যখন প্রভুর প্রতিনিধিরূপে বিধিবদ্ধভাবে তাঁর কথা প্রচার করছি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র, আমরা ভগবান্ ও ভক্তদ্বেষীর প্রতি উদাসীন হতে পারি না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর রচিত শাস্ত্রাদিতে জানা যায়, প্রত্যেক বৈষ্ণব নিজ নিজ অধিকার অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযথ আচরণ করবেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যদি কোনও ভক্ত কোন দায়িত্বসম্পন্ন পদবীতে থাকেন, যদি তিনি দেশের শাসক বা রাজা হয়ে থাকেন, তবে বৈষ্ণবনিন্দক বা সাধুদের বিদ্বেষীকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিবেন অথবা তার জিহ্বাছেদন করবেন অর্থাৎ শারীরিক দণ্ড ইত্যাদি যে যে ক্ষেত্রে যা সমুচিত, তাই করবেন। এটা কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নয়, কারণ তা হলে ত' অরাজকতা হয়ে যাবে। আমাদের কারও প্রতি শারীরিক আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীহনুমান একজন বৈষ্ণব, কিন্তু তিনিও যুদ্ধাদিতে হত্যা করেছেন। অর্জ্জুন এবং অন্যান্য ভক্তগণও যুদ্ধে নরহত্যা করেছেন। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র বহু দৈত্য দানবকে বধ করেছেন। কেবল বাহ্যিক নিরীহভাব বা ভালমানুষী দেখানটা বিনয় ও দৈন্য নয়। যখন গুরু-বৈষ্ণব, সাধু ভক্তদের প্রতি অত্যাচার হয়, নিন্দা অপমান হয়, তখন যে ক্ষেত্রে যা করা উচিত তা করতেই হবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি ভক্তি সঙ্গীতে বলেছেন যে, বৈষ্ণব সাধক অনিষ্টকারী বা নিন্দুকের প্রতি সহিষ্ণু ত' হবেনই, তার

উপরে সেই ব্যক্তির মঙ্গল কামনাও করবেন। এই জন্যই বৃক্ষের উপমা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন বৃক্ষকে কাটতে থাকে, তখন ক্লান্ত হয়ে সেই বৃক্ষের ছায়াতেই বিশ্রাম করে; বৃক্ষ কিন্তু নিজের হত্যাকারীর নিকট থেকে ছায়াকে সরিয়ে নেয় না। উপসংহারে তিনি বলেছেন, নম্রতা, কৃপা, অপরকে মর্য্যাদা প্রদান, নিজের জন্য প্রতিষ্ঠা ও সুনাম প্রাপ্তিতে অনাগ্রহ, অনিচ্ছা—এই চারিটি গুণই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকারীর প্রাথমিক যোগ্যতা।

আমরা অধমেরও অধম ত বটেই ; কারণ আমরা যে ভিক্ষুক। তাই মনে রাখা উচিত, যদিও আমরা ভিক্ষুক, তবে তা যা তা ভিক্ষা নয়, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর ভিখারী। তাই জাগতিক কোন কিছুই যেন আমাকে তা থেকে বিচ্যুত না করে। সাথে সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশের প্রতি মানদ বা সম্মানপ্রদ হওয়া দরকার।

এই ভাবে কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সব দিক থেকে বিচার করে সকলকে যথাযথ সম্মান দেব। নাম সেবার এইটাই হল পথপ্রদর্শক মাপকাঠি যে, আমরা কৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস। যদি তোমরা কৃষ্ণভজন—কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করতে চাও, তবে জগতের ছোট ছোট ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে, জাগতিক আরামদায়ক বস্তু, অর্থ বা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা যেন তোমার লক্ষ্য বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রেখো, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের প্রয়াসী, আর সবই ঐ কৃষ্ণ-চেতনার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য। সুতরাং তোমাদের সময়ও সামর্থ্যের অপচয় কোরো না, খুব হিসাবী হও, মিতব্যয়ী হও—জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছাবার সুযোগ তোমার আছেই।

অহৈতুকী ভক্তি

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশঃ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ।। ৪ ।।

অনুবাদ ঃ

হে প্রভো! আমি ধন চাই না, অনুগামী লোকজন চাই না, সুন্দরী নারী, মুক্তি এ সব কিছুই চাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তোমার অহৈতুকী প্রেম-সেবা করতে পারি।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদ্গিকে এই পথে এগিয়ে যেতে বলেন, "আমি টাকা-কড়ি, সোনা, মণিমাণিক্য কোন ধনই চাই না, জগতে যশ প্রতিষ্ঠা বা অনুগত লোকজনও চাই না ; সুন্দরী নারীর সঙ্গ কামনাও আমার নাই। সুনাম বা কবি খ্যাতিও আমার দরকার নাই।" এ হল উক্ত শ্লোকের সাধারণ অর্থ। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় আরও গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

আমাদের গুরু মহারাজ এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন যে, ধন, জন, নারী এবং কবি যশ এর অন্তরালে duty, wealth, sense pleasure and salvation অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষ নিহিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় ব্যক্ত করেছেন ; ধন বলতে নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী কর্ত্তব্য পালনের মাধ্যমে অর্থাৎ সদ্‌বৃত্তি দ্বারা-লব্ধ অর্থ বা আর্থিক সচ্ছলতা। 'জন' বল্‌তে

নিজের comfort বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচারকবর্গ। 'সুন্দরীং' অর্থ কাম-তৃপ্তি বা সুন্দরী নারী-সঙ্গ। 'কবিতাং' অর্থ কাব্য বা মোক্ষ। মোক্ষ শব্দের অর্থ আপাততঃ খুব উচ্চস্তরের কথা মনে হয়। কিন্তু আসলে কাব্য-কবিতার মত এও flowery words, স্তোকবাক্য মাত্র। মোক্ষ এক প্রকার কল্পনা মাত্র কারণ প্রকৃতপক্ষে মোক্ষের শেষ পর্য্যায় ত' নির্বাণ, আত্মসত্তার বিলুপ্তি!

সেবার পুঁজিপতি (Service Capitalist) ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, হে প্রভো! আমি কেবল তোমার প্রতি সহজাত অহৈতুকী ভক্তি চাই, তার কোনও প্রতিদান চাই না। আমি সহজাত সেবাপ্রবৃত্তির প্রয়াসী। প্রেম অর্থে ভালবাসা, affection, love, আমি তোমার সেবাই করবো, আর তুমি তার পারিতোষিকরূপে আরও সেবা করবার প্রবৃত্তি, সামর্থ্য ও লালসাই দান করবে—এরই নাম প্রেম। আমার সেবাপ্রবৃত্তি আরও বাড়বে আর তার interest—সুদই হবে আরও সেবা করবার মূলধন, Capital—ঠিক যেমন হয় money lending business এ—টাকা সুদে খাটাবার ব্যবসায়ে। এইভাবে ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—"প্রভো! আমি ত' তোমার সেবা করছি, আর যদি তুমি তার বদলে আমাকে কিছু দিতে চাও, তাহলে দাও—আরও মূলধন দাও, যাতে করে আমার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।"

আমি নিজের কর্মফলে যেখানেই জন্মাই না কেন, হে প্রভো! আমি কেবল তোমার সেবাই চাই, তার প্রতিদানে অন্য কিছুই চাই না। সাধারণতঃ আমাদের চারিদিকে যে সব প্রলোভন ঘিরে ধরেছে, সেগুলো হল—ধন, জন, নারী আর মোক্ষকামনা অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এইভাবে জীবনের চার পুরুষার্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন ঐসব পুরুষার্থের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। কিন্তু কেবল তোমাকেই চাই প্রভো! আমি মুক্তি পেতে চাই না। আমি কখনও তা চাইব না—হে প্রভো! আমাকে এই সংসার থেকে মুক্তি দাও। মুক্তি পেলে আমি তোমার সেবা ভালভাবে করতে পারব—এ প্রকার condition বা চুক্তি ভগবানের সঙ্গে করা চলে না। এইটাই হল সবচেয়ে নিষ্কাম প্রার্থনা—নিজের কর্ম-দোষে আমি পশু, পক্ষী যে জন্মই পাই বা স্বর্গে, নরকে যেখানেই যাই, তাতে কোন ক্ষতি নাই। আমার সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা কেবল একটিতেই কেন্দ্রিত—তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ যাতে হারিয়ে না যায়, আমি চাই তা আমার যেন প্রতিদিনই বাড়তে থাকে।

Devotion—ভক্তি হচ্ছে অহৈতুকী, তার কোন হেতু নাই। এইটিই জীবের সহজাত প্রবৃত্তি অন্য কোন কামনা-বাসনা তাতে নাই। কেউ হয়ত' বলতে পারে, যদি সুদই সবসময় মূলধন—capital রূপে খাটান যায়, তবে ত' আমি কোন লাভই পাব না! কিন্তু আমাদের বিচার ত' আলাদা। আমাদের enjoyment-ই হল self-giving—নিজেকে দিয়ে দেওয়া—অপরে আমায় নিয়ে enjoy করুক এইটাই হল highest enjoyment এর basis—মূলভিত্তি। ভক্ত ভাবে—Let Krishna enjoy with others—I will be the scape-goat, যত সম্ভোগ কৃষ্ণেরই তাঁর নিত্য পরিচরগণের সঙ্গে ; আমি ত' কেবলমাত্র সেবাদাস।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, "শিশুর যখন কোন জ্ঞানই থাকে না, তাকে রোগে বা শত্রুতে আক্রমণ করলে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঠিক তাই, যখন কোন সাধকের নামপ্রভুর সম্পর্কে কোন জ্ঞানই হয় নাই, তখন তার সেটা শৈশবাবস্থা, সেই অবস্থায় তার নামাপরাধ ইত্যাদি হওয়া স্বাভাবিক। যখন তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়

তখন কোন অপরাধ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার অপরাধের আশঙ্কা আছেই।

Suicide Squad—আত্মঘাতী সেনা ঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, "কৃষ্ণনাম এতই সুন্দর, মধুর, উদার, চমৎকার! আমি বরং সকল নামাপরাধ নিজের মাথায় নিয়ে মরি, অন্য সকলে সেই নামামৃত আস্বাদন করুক।" তিনি নিজেকেও বলি দিতে চান, ঠিক যেমন যুদ্ধ সময়ে হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় সৈন্যেরা নিজের বগলে বম্ বেঁধে শত্রু জাহাজের চিম্‌নির ভিতর লাফ দেয়। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জাপানী Suicide Squad এর সৈন্যেরা এই রকম দুঃসাহসিক কাজ করেছিল। সেই সাহসের কথা শুনে হিটলার বলেছিলেন, "এখনও আমাদের জাপানীদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা করার আছে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রার্থনা করেন—

"নাম প্রভুর চরণে যতরকম অপরাধ আছে, সে সব নিয়ে আমি শেষ হয়ে যাই, অন্য সাধকেরা নামরসামৃত আস্বাদন করুক।"

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও বলেছিলেন, "প্রভো! পৃথিবীর জীবের যত পাপ আছে, তা আমাকে দিয়ে নরকে ফেলে দাও, তাদের উদ্ধার কর—তাদের কৃষ্ণপ্রেম দাও।" কিন্তু ভক্তদের এই মহান্ উদারতার জন্য তারা কখনও বিনাশ পান না। বলা হয় die to live, বাঁচার জন্যেই মরা। প্রভুর চরণে যাঁদের এই প্রকার প্রেমভক্তি রয়েছে, তাঁরা ত' অনন্ত শাশ্বত জীবনই লাভ করে। এইটীই প্রকৃত সুখ—যা আমরা পাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে এই প্রকার sentiment প্রেমসেবার কথা বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এই প্রেমের উদাহরণ আর একটি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এক সময় কৃষ্ণের মাথাধরার জন্য ভক্তের

পদধূলির প্রয়োজন হল। শ্রীনারদ তা সংগ্রহের জন্য প্রথমে দ্বারকার মহিষীদের কাছে গেলেন। কিন্তু স্বামী হলেও কৃষ্ণত' স্বয়ং ভগবান এই জন্য তারা অপরাধের ভয়ে পদধূলো দিতে চাইলেন না। শেষে নারদ বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীদের কাছে কৃষ্ণের আরোগ্য লাভের জন্য তাঁদের পদধূলো চাইলেন এবং তাঁরা সাগ্রহে তাড়াতাড়ি তা দিয়েছিল। এইটাই হল কৃষ্ণের সুখের জন্য আত্মত্যাগের চরম সীমা এবং এইটাই হল পরিপূর্ণ ভক্তি। ভক্তের জীবনই কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য। যেখানে যত ত্যাগ, সেখানে ভক্তির গাঢ়তাও তত বেশী। আর ঐ ত্যাগই হল Die to Live বাঁচার জন্য মরা। কৃষ্ণই হচ্ছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা তাই তাঁর জন্য আমরা নিজেকে সম্পূর্ণ দিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হব না।

স্বরূপ-জ্ঞান

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ।। ৫ ।।

অনুবাদ ঃ

হে নন্দতনুজ! আমি তোমার নিত্যদাস। তথাপি আমি নিজ কর্মদোষে এই জন্ম-মৃত্যুর সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হয়েছি। এই পতিতাধমকে তুমি দাস বলে গ্রহণ কর এবং তোমার শ্রীচরণের একটি ধূলিকণারূপে মনে কর।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করছেন, হে নাথ! আমার প্রতি কৃপা কর। আমি তোমার কৃপাকটাক্ষের পিয়াসী! আমি নিজের কি করে ভাল করতে হয় তাও জানি না। তাই তোমার করুণা চাই। কৃপা করে আশ্রয় দাও, তোমার প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করতে দাও। তুমিই ত আমার রক্ষাকর্ত্তা সর্বস্ব। আমি তোমার আশ্রয় চাই।

তিনি কে? আমরা ত ভগবানের কত প্রকার স্বরূপের কথা শাস্ত্রে শুনে থাকি। কিন্তু আমরা ভগবানের সেই মধুর, সুন্দর স্বরূপের কাছে এসেছি—কৃষ্ণের কাছে এসে গিয়েছি। সে কৃষ্ণ নন্দমহারাজের আদরের দুলাল। তিনি কেবল বৃন্দাবনেই থাকেন আর কোথাও ঐ মধুর হতে সুমধুর নন্দদুলালকে পাওয়া যায় না। এককালে মহান্ পণ্ডিত এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তশিরোমণি শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মথুরাতে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য এসেছিলেন। সেখানে উভয়ের মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠীতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যের আলোচনা হয়েছিল।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কাকে আমাদের ইষ্টদেব বলে আরাধনা করব? জীবনের চরম লক্ষ্য কি? ইত্যাদি।

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় উত্তরে বললেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

জগতে যারা জন্ম-মৃত্যুভয়ে ভীত, তারা শ্রুতি বা বেদের নির্দেশে চলুক, অপরে মহাভারতাদি স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ করুক, কিন্তু আমি সেই নন্দরাজার বন্দনা করি, যাঁর আঙ্গিনায় পরংব্রহ্ম ছোট শিশুটি হয়ে খেলা করেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম পালনকারীরা বৈদিক উপদেশ পালন করে সামাজিক জীবনযাপন করে। সাধারণ জনতা স্মৃতির অনুসরণ করে। এই ভাবে সকলেই ঈশ্বর সম্পর্ক রেখে দৈহিক কর্ত্তব্য পালন করে। আর যাঁরা জাগতিক কামনা-বাসনাকে জয় করে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে চায়, তারা উপনিষদের অনুসরণ করে। কিন্তু রঘুপতি উপাধ্যায় বলেন, আমি ঐ সবকে তোয়াক্কা করি না। আমি আমার হৃদয়ের প্রেমবৃত্তির অনুসরণ করব। মস্তিষ্ক-কসরতের কোন প্রয়োজন আমার নাই। আমার বিচারে বাস্তব শান্তি হৃদয়ের ব্যাপার, মস্তিষ্কের নয়। আর আমার হৃদয় কেবল নন্দমহারাজকেই চায়। শাস্ত্রে বলেন, "কৃষ্ণই পরাৎপর পরতত্ত্ব পরংব্রহ্ম, এবং সেই পরম্‌বহ্ম নন্দমহারাজের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করেন। আমি ত' বাস্তব পরম সত্যস্বরূপকে সশরীরেই দেখতে পাই।"

নন্দ কি করে পরতত্ত্ব পরংব্রহ্মকে এইভাবে বশ করলেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।৪৬ শ্লোকে ভক্তরাজ পরীক্ষিত মহারাজ অপূর্ব্ব বালক সাধু ব্রহ্মবিৎ শুকদেব গোস্বামীকে এই প্রশ্নই করেছিলেন,—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ।।

হে ব্রহ্মজ্ঞ! আপনি ত' সর্বদা ব্রহ্মানন্দে লীন। জগতের কোন জড় সত্তার বোধ আপনার নাই। কারণ আপনি সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। জড় জগতের প্রতি আপনার চেতনা কখনও দৃক্‌পাতও করে না। আর আপনিই বলেন, কৃষ্ণই চরম পরম সত্যস্বরূপ। আমি একটা কথাই জিজ্ঞাসা করি প্রভো! নন্দ কি এমন সাধনা করেছিলেন, তিনি পরম সত্য স্বরূপের এমনকি পরিচয় পেয়েছিলেন যাতে সেই পরমপুরুষ তাঁর এতই আপন হয়ে গেলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করলেন, তাঁর আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করলেন। মনে হয় তিনি নন্দমহারাজের একেবারে বশীভূত হয়ে গেলেন? এ কি রকম? এটা ত' অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! এও কি সম্ভব?

পরাৎপর পরমতত্ত্ব মা যশোদার স্তন্যপান করেন?

যোগী, ঋষি, তপস্বী জ্ঞানীগণ বলেন যে, এক এক সময় তাঁরা উপাস্য তত্ত্বের ক্বচিৎ সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন সমাধি অবস্থায়। তারপরে হঠাৎ তাঁরা ফিরে আসেন। অধিক সময় ধরে তাঁরা সেই স্তরে থাকতে পারেন না। তাহলে সেই পরতত্ত্ব মা যশোদার কোলে বসে তাঁর স্তন্যপান করেন? যদি এটা সত্য, আর এও যদি সম্ভব, তা হলে আমরা সেই সহজ পথটি বেছে নেবো না কেন—যাতে সেই পরংব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের এতটা আত্মীয় সম্পর্ক হয়ে যেতে পারে।

তাই রঘুপতি উপাধ্যায় তাঁর প্রার্থনায় দম্ভের সঙ্গে বলেন, আমি শাস্ত্রের এত শত সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচারের গোলকধাঁধায় ঢুকতে চাই না। আমি মাত্র সেই নন্দ ও তাঁর পরিজনের কাছে শরণাগত হয়ে যাই—নন্দ যেখানে বড় কর্ত্তা গৃহের মধ্যে, তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে যেতে চাই।

শ্রুতি-স্মৃতি নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম করলে উত্তম লোকে যাওয়া যায়। আর কর্ম যোগ ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানমার্গে মুক্তির জন্য সাধনা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি আরও উন্নততর স্তরের সাধু-গুরু—যেমন নন্দ মহারাজ ও তাঁর পরিবার—এঁদের একজন হয়ে গেলেই আমরা শরণাগতিদ্বারা সেই প্রেমের রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারি।

আমার সাধারণ জ্ঞান, আমার পরমার্থ সম্পর্কে বিশ্বাস এই কথাই বলে, যদি সেই পরতত্ত্ব এতই দুর্লভ হয়েও তাঁকে বাস্তব, একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আপনজনরূপে—হৃদয় নিয়ে পেতে পারি, তবে মিছিমিছি এই ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকারটাই কি? যদি কেউ বলে যে, চিলে কানটা নিয়ে গেছে, তবে কানে হাত দিয়ে না দেখে চিলের পেছনে দৌড়াবার দরকার কি? তাই যদি পরতত্ত্বকে এতই সহজে এতই আপন করে পাই তবে এখানে সেখানে দৌড়াবার দরকার কি? যদি এটা জানতে পারি যে, ঐ দুর্লভ পরতত্ত্ব কৃপাকরে তাঁর যাবতীয় মাধুর্য্য ও চমৎকারিতা নিয়ে আমার এত নিকটতর হয়ে নেমে আসেন—যা সিদ্ধ মহাপুরুষগণ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, পেয়েছেন, তাহলে আমি আর সেই তপস্বী, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও ত্যাগী বৈরাগ্যবাদীদের মত মরীচিকার পেছনে শুধু দৌড়াদৌড়ি করি কি জন্যে?

এটা ত' সাধারণ জ্ঞান। ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্র বলেন যে, নন্দনন্দন কৃষ্ণই পরংব্রহ্ম—এটি ত' খুব সোজা কথা। আর

আমরা যখন সেই সোজা কথাটা বুঝবার স্তরে পৌঁছে গেছি, তখন আমরা ত' সোজাই কৃষ্ণকে বলতে পারি—হে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ! প্রেম রাজ্যের রাজা! আমি তোমারই প্রেম ও করুণা চাই। আমি তোমারই দাস। আমি ত বুঝেই রেখেছি—অনুভব করেছি, তোমার সাথে আমার স্নেহ-সম্বন্ধ আছেই। আমি তোমারই আশ্রয়ে আছি। কিন্তু অবস্থাগতিকে আমি এখন অসুবিধায় পড়ে গেছি। আমায় এমন কতকগুলি শত্রু ঘিরে রয়েছে, যারা কিছুতেই ছাড়ে না, তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়, সবসময় তোমার সেবা করি—এটা তারা চায় না—তোমার সেবায় নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটায়। তবুও ত' আমি জানি আমার অন্তরে তুমিই আমার প্রভু—তুমিই আমার সর্বস্ব। তোমার সঙ্গ না হলে আমার হৃদয় কিছুতেই শান্তি পাবে না। তাই তোমার কাছে আর্তি জানাই—তোমার কৃপা না হলে আমি এ দুর্দ্দৈব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারব না—এ বন্ধন আমার কাটবে না।

আত্মার স্বরূপ—সূর্যের কিরণকণাসদৃশ ঃ

এখানে বলা হয়েছে "আমার মনে হয় আমি তোমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত নই যদি তা হত, তা হলে, আমার এ বিচ্ছেদ অসম্ভব। আমি ত' তোমার স্বাংশ অবতারও নই। অন্যান্য অবতারবর্গ কৃষ্ণের স্বাংশ, কিন্তু জীবাত্মা ত বিভিন্নাংশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, জীব তাঁর নিত্য অংশ। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি থেকে জীবের উৎপত্তি।

"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ"

এবং জীব সূর্য্যের কিরণকণের মত, অতি সূক্ষ্ম পরমাণু সদৃশ কৃষ্ণ শক্তির অংশবিশেষ। কিন্তু এখানে ভক্ত বলেন, 'আমিত কিরণকণ সদৃশও নই, আমি তোমার পদধূলির একটি কণা, তোমার শ্রীঅঙ্গ

-জ্যোতির একটি কণাসদৃশও আমি নই।' এইভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আমাদের হয়ে বলতে চাইছেন যে, আমাদের প্রার্থনা এইরূপই হওয়া উচিত। আমি তোমার অচ্ছেদ্য অংশাংশ—এত বড় কথা বলার সাহস আমার নাই। আমি সত্যিই তোমা থেকে বিচ্যুত একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা, কিন্তু তবুও তোমার করুণাই আমি চাই। তাই আমার প্রতি দয়া কর। তোমার কাছে আমার এ দাবীকে একটা বিশেষ কৃপা বলেই স্বীকার কর। তোমার সাথে যে কোনও একটা সম্বন্ধ জুড়ে দিও, তা যতই ছোট হোক না কেন। কিছুই যদি না পার, তবে এইটুকু দয়াই কর! তোমার শ্রীচরণের একটা ধূলিকণাও করে নিও—এই আমার নিবেদন!

কৃষ্ণসান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্য বর্ণন ও সিদ্ধি-লালসা

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ্‌-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ।। ৬ ।।

অনুবাদ ঃ

হে নাথ! এমন দিন কবে হবে—যখন তোমার নামকীর্ত্তন করতে করতে শ্রাবণের বারিধারার মত আমার চোখের জল নেমে আসবে! গলার স্বর প্রেমানন্দে কাঁপবে, শরীরে রোমাঞ্চ হবে।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

এই শ্লোকেতে জানা যায়, ভক্তের প্রার্থনা পূরণ হয়েছে এবং তিনি কৃষ্ণের প্রেমের রাজ্যে একটি পদও পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ত আশার অন্ত নাই যদিও তিনি নিরাপদ অধিকারটুকু পেয়ে গিয়েছেন, তিনি এখন আবার পদোন্নতি চাইছেন। প্রথমে ত' তিনি কৃষ্ণের শ্রীচরণের পদধূলির একটি কণামাত্র হতে চেয়েছিলেন, তা ত' মঞ্জুর হল ; কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধূলিকণার নিকট এসেই তাকে গ্রহণ করে নিল ; তার পরেই ধূলিকণাটির এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হল, যেন কেউ ম্যাজিকের ছড়িটি বুলিয়ে দিয়ে তার ঐ পরিবর্ত্তন করে ফেলল। এখন আরও বড়, আরও উচ্চতর দাবী আপনিতেই এসে পড়ল।

ভক্ত চিন্তা করছে, "কি হল? আমিত' কেবল তোমার পদধূলিকণা হতে চেয়েছিলাম! কিন্তু একি হল? আমি ত' কেবল একটি ধূলিকণা,

আর তুমি ত' সর্বেশ্বরেশ্বর পরতত্ত্ব ; কিন্তু তোমার পাদপদ্ম স্পর্শমাত্রেই ঐ ধূলিকণাটাই এত বড় অচিন্ত্য বস্তু কি করে হয়ে গেল? একি? আমি যে একেবারে বদলে গেছি! এখন আমার আরও বড়, আরও নিবিড়তর সম্বন্ধ পাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে! প্রথমে আমি কেবল একটু ধূলিকণা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার পদস্পর্শে সেই আশা আরও বেড়ে গিয়েছে—তাই এখন স্বাভাবিক আকর্ষণে পরিণত হয়েছে''—এইটাই হচ্ছে রাগমার্গ।

প্রেমের রাজা ঃ

সাহজিক আকর্ষণ কেবল কৃষ্ণেরই আছে—শ্রীনারায়ণস্বরূপে নাই। বা শ্রীরামস্বরূপে নাই। 'কৃষ্ণ' সেই প্রকাশ, manifestation যাঁকে প্রেম বা স্নেহের দ্বারা উপাসনা, ভজন করা চলে। কৃষ্ণই হচ্ছেন প্রেম ও আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ভক্তের সমগ্র ভক্তি, প্রেম কৃষ্ণের সম্বন্ধস্পর্শে আসা মাত্রই তার পরিবর্ত্তন, transformation হয়ে যায় এবং ভক্ত আরও নিবিড় সম্বন্ধ চায় এবং তা হয়েও যায়। সে এমন একটা স্তরে পৌঁছে যায় যে তার প্রার্থনা বদলে যায়। সে ভাবে একি হল? আমি ত' চোখের জল থামাতে পারি না! অনবরত বয়ে চলে! আর আমি যখন তোমার নামকীর্ত্তন করি তখন নিজেকে control করতে পারি না—সামলাতে পারি না! অন্তরে আর একটা কি ভাবাবেগ আসছে যাতে করে আমার সবই উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে—আমার সাধারণ আশা, আকাঙ্খা সবই গুলিয়ে যাচ্ছে! আমি যেন আর একটা plane-এ পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে! আমি কি করি? কোথায় যাই? আমি যেন আর কারও হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছি!

কৃষ্ণপাদপদ্ম—যাদুদণ্ড ঃ

আমার আশা আমাকে আর কোথায় নিয়ে চলেছে! এখন আমি

ত' কেবল দূরে থেকে তোমার সেবা করতে চাই না, কারণ তোমার পাদপদ্মস্পর্শে আমার আশা আকাশ ছুঁয়েছে। আমি দেখছি এত সেবক, ভক্ত তোমার কত রকম সেবাই করে যাচ্ছে, তাই দেখে আমারও আশা বেড়ে যাচ্ছে।

আমি এখন সেই plane-এ যেতে চাই যদিও তা থেকে আমি অনেক দূরে আছি। এখন আমার কাতর প্রার্থনা—আমাকে সেইখানেই নিয়ে যাও, তোমার চরণস্পর্শই ত' আমার এ আশা জাগিয়ে তুলেছে। তুমিই আমাকে যেমন ইচ্ছা চালাও—যেমন ইচ্ছা খেলাও, আমিত এটিই চাই। যখন আমি এই অনুভূতি নিয়ে শ্রীনাম ভজন ও কীর্ত্তন করি তখন লক্ষ্য করি যে আমার পূর্ব্বের ধারণা বা অনুভূতি সব পাল্টে গিয়েছে। তখন আমার এক নতুন শুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগের সুতীব্র লালসা জাগে। হে প্রভু! আমার একান্ত প্রার্থনা যে তুমি আমায় তোমার সেই দিব্য প্রেমের রাজ্যে তুলে নাও।

উন্নত অধিকারে বিপ্রলম্ভরস-বর্ণনা

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।। ৭ ।।

অনুবাদ ঃ

হে গোবিন্দ! তোমার বিচ্ছেদে সমস্ত জগৎ শূন্য দেখছি। বরষার বারিধারার মত আমি চোখের জলে ভাসছি। তোমার বিরহে এক নিমেষও যুগের মত মনে হয়।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

কেহ কেহ এই শ্লোকের অনুবাদে লিখেছেন, হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে আমার এক নিমেষ একটি যুগের মত অর্থাৎ ১২ বৎসরের অধিক মনে হয়। 'যুগ' শব্দের অর্থ ১২ বর্ষ বলে উল্লেখ দেখা যায়। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ 'যুগ'কে ১২ বর্ষ বলার যথার্থতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলে থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাভাবভাবিত হয়ে বিপ্রলম্ভ-দশা ১২ বর্ষ ধরে প্রকট করার লীলা করেছিলেন। এও একপ্রকার ব্যাখ্যা। কিন্তু অন্য অর্থে যুগ বলতে millenium বা age অর্থাৎ চতুর্যুগের মত এক যুগ বা লক্ষ লক্ষ বৎসর বা অনন্ত কালও বুঝায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, এক নিমেষ এক যুগের মতই মনে হয় এবং আমার নয়ন থেকে বর্ষার ধারার মত অশ্রু ঝরে। বর্ষাঋতুতে অনেক প্লাবন হয়ে থাকে। আমার চক্ষেও সেইরকম প্লাবন আসায় দৃশ্য বস্তুও আমার চক্ষে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই আমি এমতাবস্থায় যেন কিছুই দেখতে পাই না। আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে

যে, আমি আমার চারপাশে অন্য কিছুই দেখতে পাই না। সবই শূন্য দেখায়। কারণ গোবিন্দ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ—মূর্তিমান সৌন্দর্য্য ঃ

"আমার এইরকম বিচিত্র অবস্থা হয়েছে, কোন কিছুতেই মন আর যায় না। আমার সমস্ত চিন্তা কেবল গোবিন্দকে নিয়ে এবং তা এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে যে আমি আর যেন আমাতেই নাই, কোন জ্ঞানই নাই, কোন চিন্তাই আর মনে আসছে না। মন কোথায় চলে গিয়েছে—সেই অনন্তের পেছনে। যখন অনাবৃষ্টি হয়, তখন নদ, পুকুর সব শুকিয়ে যায়। জল বাষ্প হয়েই আকাশে উঠে যায়। কোথায়ও একবিন্দু জল পাওয়া যায় না।

আমার অবস্থাও ঠিক তাই। আমার সমস্ত সুখচিন্তা শুকিয়ে গিয়েছে—সবই শূন্য দেখছি। আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন—সব কিছুই সেই সর্বসৌন্দর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ, সর্ব্বচমৎকারী, সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণই আকর্ষণ করে নিয়েছেন। আর কখন কখন তাঁর একটু বিচ্ছেদ এক যুগ বলে মনে হয়। ভক্ত ভাবতে থাকে কতকাল ত' কৃষ্ণকে দেখি নাই, কবে দেখেছি বলে মনেই হচ্ছে না। আবার কখনও একটু ক্ষীণ স্মৃতিও আসে—কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হয়েছিল ; সে ত' কবে! কতকাল পূর্বে, সে ত' অনেক আগেকার কথা ; তারপরে কত যুগ পেরিয়ে গেছে! হয়ত' একটু আধটু মনে পড়ছে, কিন্তু তা বুঝি আর পাব না চিরকালের জন্য। ভক্ত এই রকমই হতাশা, disappointment ও despair-এর মধ্যে কাল কাটাতে থাকে।

এইটিই হল পরজগতের standard, আমরা যেমন গ্রহ নক্ষত্রদের দূরত্ব light year দ্বারা মেপে থাকি, ঠিক সেই রকম পরজগতের temperament এই রকম standard-এ বিচার করতে হয়। এত

বড় উচ্চদরের বস্তু যা আমাদের অধিকারের অতীত তাঁকে নিয়ে অনুশীলন করার মত কি এতটা স্পর্ধা আমাদের আছে!

ভক্ত প্রথমেই ভেবেছিলেন, আমি যদি সেই ভূমিকায় যাই তবে আমার আশা পূর্ণ হবে। আমার পিয়াসার তৃপ্তি হবে এবং আমি কিছুটা শান্তি ও সোয়াস্তি পাব। কিন্তু তাঁর ভক্তির গাঢ়তা তাঁকে জীবনের এই রকম unexpected plane-এ নিয়ে যায়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে সে প্রেমের একবিন্দু যখন রোগীকে দেওয়া যায়, রোগী হয়ত ভাবে, সে শান্তি পেয়েছে, কিন্তু আসলে রোগ ত' বেড়েই যায় এবং সে একটা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছায়।

ভক্ত আরও ভাবতে থাকে, "ভক্তদের চক্ষে অশ্রুর ধারা, তাঁদের রোমাঞ্চ ও বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা নামকীর্ত্তনের সময় দেখে আমি ত' বিস্মিত হয়ে গেছি। ঐ অবস্থায় পৌঁছাবার জন্য আমারও মন চায় ; কিন্তু ঐ অবস্থায় পৌঁছেও দেখতে পাই ঠিক তার উল্টোটা!"

কৃষ্ণের সাথে ঐ প্রেমসেবা ভূমিকায় পৌঁছেও ভক্ত বুঝতে পারে—এর ত' শেষ নাই! বরং যতই তাঁর নিকটতর হই, ততই লালসা বেড়ে চলে—এর শেষ কোথায়? যতই এগোই, ততই অতৃপ্তি—হায়! কিছুই পেলাম না! কিন্তু ফিরবার উপায় নাই। পেছনে পা ফেলা যায় না, কেবল এগোতে থাকে—এইত' প্রকৃত ভক্তের অবস্থা!

পথ দূরে, আরও দূরে। তখন হতাশা আসে, অমৃত আমার হাতের কাছেই, কিন্তু তার আস্বাদ পাই না, পেয়েও ধরতে পারি না—কিন্তু তার charm এমনিই, তাকে ছাড়াও যায় না, আর তার অভাবে নিমেষও যুগের মত মনে হয়।

চক্ষের বারিধারা ঃ

ভক্ত চিন্তা করে চলে, কত যুগ পেরিয়ে গেল। তবুও আমার অভাব ঘুচে না। পেতে চাই, কিন্তু পাই না—সময় বয়ে চলে। কাল অনন্ত ; চক্ষের ধারা অনবরত বয়ে চলেছে—চক্ষের জলে বুক ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁকে ত' ধরতে পারি না! তাই সব দিক্ শূন্য দেখছি, ভবিষ্যতেও হবে—এ ভরসাও পাইনা, এই ব্যাধির উপশম হয় এমন কোন কিছুই ত' দেখি না।

কেই বা আমায় সান্ত্বনা দেবে? সব পথই ত' বন্ধ! কৃষ্ণের প্রেমপাশে বাঁধা পড়েছি! কেউ কি আছে? আমাকে বাঁচাতে পারে! হায়! আমি যে শেষ হয়ে গেলাম! বাঁচাও আমাকে!

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, "আমরা যখন কৃষ্ণপ্রেমের একটুও স্বাদ পাই তখন আর তাকে ছাড়া যায় না, তৃষ্ণা বেড়েই চলে, তবুও তৃপ্তি হয় না। আপাতত এই রকম দুর্দ্দশাই ভোগ করি।"

কৃষ্ণের তৃষ্ণা যার চিত্তে প্রবেশ করে তারই এই রকম অবস্থা হয়। তার চিত্ত সব কিছুই ছেড়ে দেয়, আবার সব কিছুতেই কেবল কৃষ্ণকেই দেখে—সমগ্র হৃদয় জুড়ে তখন কৃষ্ণই তাকে গ্রাস করে বসে।

এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণচেতনার সিদ্ধিলাভের অবস্থাই বর্ণনা করেছেন। ভক্তের কৃষ্ণকে পেয়েও না পাওয়ার যে বিরহ বেদনা তাই এই শ্লোকে প্রকটিত হয়েছে। ভক্ত সিদ্ধিলাভের যতই শীর্ষে 'আরোহণ করতে থাকেন ততই তাঁর আশা বাড়তে থাকে। ততই তিনি নিজেকে শূন্য, রিক্ত মনে করতে থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকে আমাদের উপদেশ ছলে বলেছেন, "কৃষ্ণের প্রেমামৃতসাগর অগাধ, তার কূল-কিনারা নাই। তুমি ত' মাত্র একবিন্দু! সাগরে ঢুকে পড়লে তোমার স্থিতি কোথায়, তাই ভাব!

স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।। ৮ ।।

অনুবাদ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ আমায় ভালবেসে আলিঙ্গনই করুন, কিংবা তাঁর পদতলে পিষেই ফেলুন, আমাকে দেখা না দিয়ে আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে ছারখারই করুন, সে লম্পট যা ইচ্ছা তাঁর তাই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেহ নয়।

অমৃত-প্রভা ভাষ্য ঃ

এই শ্লোকই ভক্তের ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধী। আমরা অসীমকে সীমার মধ্যে পেয়েছি। তাই এই principle-কে সবসময় আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। আমরা অসীমের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে যাচ্ছি, তখন একথাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি প্রেমের, সৌন্দর্য্যের দেবতা হলেও তিনি অসীম। আমাদের কাছে তিনি এক, কিন্তু তাঁর ত আমাদের মত বহু ভক্ত, তিনি আমাদিগকে প্রেমে আলিঙ্গন, আদর করলেও আমরা তার উল্‌টোটার জন্যও প্রস্তুত থাকব। কৃষ্ণের আদর ও অনাদর—দুটোর জন্যই আমার নিজেকে প্রস্তুত রাখব ; যে কোন বিপরীত ব্যবহার—অনভিপ্রেত ব্যবহার পাই, সবই সমানভাবে গ্রহণ করব।

কৃষ্ণ কোন সময় উদাসীন হতে পারেন। তিনি আমাদের অনাদর করে যখন কোন পীড়া দেন তাতে তিনি যে নিকটতর তা বুঝতে হবে, কিন্তু যদি উদাসীনতা দেখান, তবে তা যথেষ্ট অসহ্য দণ্ড বলে মানতে হবে। ভক্ত তখন চিন্তা করে, কৃষ্ণ আমাকে এত এড়িয়ে যাচ্ছেন, এত অনাদর করছেন যে, বোধ হয় তিনি আমার সাথে কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। তিনি কি আমাকে জানেন না? আমি কি তাঁর পর? তাঁর অজানা। তাঁর দণ্ডকেও তাঁর কৃপা বলে মাথা পেতে নেব। কিন্তু তাঁর উদাসীনতা ত' অসহ্য! সবচেয়ে বেশী পীড়াদায়ক।

ভক্তের বিরহবিধুর যন্ত্রণা এইখানেই শেষ হয় না। তা আরও গভীরভাবে তার মর্ম্মস্থলে আঘাত হানে। কৃষ্ণ যখন আর কাউকে ভালবেসে আমার চক্ষের সামনেই আলিঙ্গন-চুম্বন করেন, তাতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না, তখন ভাবে এ ত' আমারই দাবী ; আমারই সামনে আর কেউ কেড়ে নেবে!—এই ভাবনাতেই তার দুঃখ-যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে।

এই ত' প্রেমের রীতি, প্রেমের স্বভাব! প্রেমের রীতি সবই সহিতে পারে, কিন্তু উদাসীনতা তার অসহ্য। তবুও তা সহ্য করতেই হয়। গোড়া থেকেই আমাদের বুঝা দরকার যে, কৃষ্ণপ্রেমের অর্থই এই। সে ত' Autocrat—স্বেচ্ছাচারী। সে ত' প্রেমবিগ্রহ! আর প্রেম অর্থ দয়া justice নয়। প্রেমের রাজ্যে কোন নিয়ম খাটে না ; There is no law there। তা জেনেই ত' আমরা সেই কৃষ্ণপ্রেমকেই আমাদের সৌভাগ্য বলে বরণ করে নিয়েছি। তাই সেখানে justice আশা করার কোন মানে নাই। কৃষ্ণপ্রেমেও কোন শুদ্ধ আইনি বিধান নাই, তা ত' স্বাধীন! তা যেখানে সেখানে যার তার প্রতি হয়ে যেতে

পারে। তাই আমরা কিই বা দাবী, অধিকারটা সাব্যস্ত করব?—আমাদের কোন অধিকারই ত' সেখানে খাটে না!

সর্বোচ্চ কৃষ্ণপ্রেমের রীতিটাই এই। এই প্রেম ত rare—ক্বচিৎ কারো ভাগ্যে ঘটে! তাই আমাদের দিক্ থেকে দ্বিধাহীন আশ্রয় নেওয়া, শরণাগতিই দরকার। এইটিই প্রকৃত প্রেম। এই প্রেমের জন্য সব কিছুকেই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। 'Die to live' যদি তোমরা এই মনোভাব নিয়ে ভাল-মন্দ সবটাকেই স্বচ্ছন্দে, নির্বিকারে মেনে নিতে পার, তবে সেই exalted plane-এ পৌঁছাতে পারবে।

প্রেম আইনের ঊর্দ্ধে :

ন্যায় আইনের গণ্ডীর ভিতর থাকে। দয়া বা করুণাবৃত্তিটি কিন্তু আইনের উপরে, প্রেম ত' বটেই। প্রেম আইনের উপরে, আবার প্রেমেরও নিজস্ব আইন law আছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের এই শ্লোকটিতে এইটিই বলা হয়েছে—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন।।

চাতক পাখীর স্বভাব ত' সকলেই জানে। সে বর্ষার জল ছাড়া অন্য কোন জলই খাবে না। সে জল নদীরই হোক বা পুকুরের হোক বা সমুদ্রেরই হোক। সে কেবল উপরের দিকে ঠোঁট মেলে বর্ষার জলবিন্দুকেই চায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই উপমাটি দিয়ে ভক্তগণকে বলতে চান যে তাঁরা যেন কৃষ্ণপ্রেমের একবিন্দু ব্যতীত অন্য কোন প্রেমই না চান।

ভক্ত প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায়, "তুমি পতিত জনের বন্ধু, তাই আমার আশাবন্ধ। তুমি কৃপাই কর, আর দণ্ডই দাও, আমার তোমার পাদপদ্ম ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় নাই।"

আমাদের শরণাগতি ঠিক ঐ চাতক পাখীর মত হওয়া চাই। তার ত' কেবল দৃষ্টি আকাশ থেকে সেই বারিবিন্দুর জন্য, সে বারি প্রচুর এসে তার তৃষ্ণা দূর করুক, তাকে ভাসিয়ে দিক্, অথবা বজ্রপাত হয়ে সে ধ্বংসই হোক, তার কেবলই প্রার্থনা সেই বর্ষার বারিবিন্দু। কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেইরূপ মনোভাব হওয়া চাই। তিনি কৃপা করুন, আর নাই করুন, আমার একমাত্র পথ—তাঁর চরণেই শরণাগতি।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি শ্লোক মনে পড়ে। যখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধারাণী ও গোপীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তিনি নিজেকে তাঁদের কাছ থেকে এত দীর্ঘদিন দূরে রাখাতে তিনি যে ভয়ানক অন্যায় করেছেন, তা তাঁর অনুভব হল। তিনি তাতে নিজেকে এতটা অপরাধী মনে করলেন যে, শেষে তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন।

একজন ভক্তকবি এই প্রসঙ্গটিকে একটি শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী স্বরচিত পদ্যাবলীতে উদ্ধার করেছেন। সে সময় কৃষ্ণ ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট, কিন্তু তিনি যখন বৃন্দাবনের মাঝে গোপীগণের কাছে এলেন তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করলেন। এবং অনুতপ্ত হয়ে নুয়ে পড়ে শ্রীরাধারাণীর পা ধরতে যাচ্ছেন এমন সময় শ্রীরাধারাণী পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "এ তুমি কি করছ? আমার পা ছুঁতে যাচ্ছ কেন? আশ্চর্য্য! তোমার কি আত্মবিস্মৃতি ঘটল!

"আমিই প্রকৃত অপরাধী" ঃ

"তুমি এ বিশ্বের স্রষ্টা—প্রভু। তোমার কার্য্যের ত' কোন কৈফিয়ৎই দাবী করা চলে না—তুমিই আমার প্রাণনাথ, আমার হৃদয় সর্বস্ব, আমি তোমার ক্রীতদাসী। হতে পারে তুমি কোন কারণে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলে। তাতে কি ক্ষতি হল? তোমার তাতে দোষটা কি? তাতে কিছুই আসে যায় না। যাবতীয় শাস্ত্র ও সমাজ ত' তোমাকে সে অধিকার দিয়েই আছে। তাতে কোন দোষও নাই, অপরাধও নাই। তুমি কিছুই অন্যায় কর নাই।"

"আমিই প্রকৃত অপরাধী। নীচতা আমাতেই আছে। সব দোষই ত' আমার। আমাদের এই বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের জন্য তুমি দায়ী নও। কেনই তুমি নিজেকে এত দোষী বলে মনে করছ? আমিই যে প্রকৃত অপরাধী, তার জ্বলন্ত প্রমাণই হচ্ছে যে তোমার বিচ্ছেদেও আমি বেঁচে আছি! তোমার বিরহে মরে যাই নাই।

জগতে আমি মুখ দেখাচ্ছি! তাই তোমার প্রতি আমার প্রকৃত প্রেমই নাই। তোমার প্রেমের গাঢ়তা ত' আমার নাই! তাই আমিই ত' অপরাধী, তুমি নও। শাস্ত্রে নারীর পাতিব্রত্য ও সতীত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। তাই এখনকার মিলনে আমারই ত' তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার কথা। তোমার প্রতি যে আমার প্রেম নাই সেই জন্যই। আমি এখনও দেহ ধরে রয়েছি, লোককে মুখ দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। সত্যিই ত আমি তোমার যোগ্য নই। তাই তুমিই আমায় ক্ষমা কর। আর তা না করে তুমি ক্ষমা চাইছ? এ তো বড়ই বিপরীত কথা! এ কি? তুমি এমন কোরো না।"

কৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেমের এই আদর্শই হওয়া চাই। সসীম আমরা অসীমের প্রতি এই রকমই ভাবধারা পোষণ করব।

কোন সময় তিনি হয়ত আমাদিগের প্রতি কোন নজরই না দিতে

পারেন; আমরা কিন্তু তাঁর প্রতি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকব। এর কোন alternative নাই—বিকল্প নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উপদেশ দিয়ে বললেন যে, আমাদের কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, কারণ আমরা দীনাতিদীন, অতি নগণ্য, এই-ই আমাদের বিচার।

যদি আমরা এত বিরাট বস্তু পেতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে অবজ্ঞা করলে ত' কোন ক্ষতি নাই। নিজেকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়ার চিত্তবৃত্তিই একমাত্র কাম্য। যুদ্ধের জন্য, দেশের জন্য যে সৈনিক নিজেকে প্রস্তুত করছে তার আবার বিলাস, সুখ-সুবিধার চিন্তা করার অবসর কোথায়?

এই প্রসঙ্গে আমার মনে আছে, গান্ধীজী যখন অহিংসা সংগ্রামসেনা গঠন করলেন, তখন একজন স্বেচ্ছাসেবক চাইলেন, "আমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যাক," গান্ধীজী তাকে বললেন, "তোমার জন্য নদীর জল মাত্র যোগাড় করা যেতে পারে। কিন্তু চা নয়। যদি তাতেই তুমি রাজি, তবে চলে এস।" সেই রকম আমরা যখন কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার পরিকর হওয়ার বাসনা রেখেছি, তখন কোন চুক্তি করা চলে না। তাহলেই আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের দিক্ থেকে কোন অনুযোগ বা শর্ত রাখা চলবে না। শুধুমাত্র নিজের বর্তমান জীবনের বাহ্যিক অবস্থাতেই নয়, এমন কি আমাদের নিত্য জীবনে আমাদের দিক থেকে সকল প্রকার অভিযোগ বা শর্তকে সযত্নে পরিহার করে চলতে হবে এবং আমরা অপরিহার্য্য-ভাবেই আমাদিগের প্রভু নির্দেশিত বিধানই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করব। কৃষ্ণ আমাদের আত্মসাৎ করুন আর নাই করুন, আমরা তাঁকেই চাইব। তাহলেই সাধনরাজ্যে আমাদের উন্নতি হবে।

যে কোন উপায়েই হোক, যদি আমরা কৃষ্ণের সেবক-গোষ্ঠীতে

প্রবেশ করতে পারি, তা হলে দেখতে পাব যে প্রায় প্রত্যেকেরই স্বভাব এই রকম। যখন তাঁরা মিলিত হন, তখন পরস্পর একে অন্যকে ঐ অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে থাকেন। বিভিন্ন সেবা-সম্পর্কে একই স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন সেবকগোষ্ঠী রয়েছেন এবং তাঁরা কৃষ্ণকথা বলেই পরস্পরকে সান্ত্বনা দেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা
বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং
তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।

আমার ভক্তগণ পরস্পর মিলিত হন, আমার কথা কীর্ত্তন করেন, এবং ভাব বিনিময় করে পরস্পরকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁরা এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে বুঝা যায়, তাঁরা আমার সম্বন্ধীয় আলাপেই বেঁচে থাকেন—এইটিই তাঁদের আহার। এইটিতেই তাঁরা সব চেয়ে বেশী আনন্দ পান এবং যখন তাঁরা আমার কথা বলেন, তাঁরা মনে করেন যেন তাঁরা আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থম্
অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নশ্যামি আত্মভাবস্থো
জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।

"যখন আমার ভক্তগণ আমার বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের নিকট হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের আমার সঙ্গদান করে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ করি।"

বেদনাতেও সুখানুভব ঃ

শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর একটি সুন্দর

ও উচ্চতর সান্ত্বনার কথা প্রকট করেছেন। আর ঐ কথাটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।

ভয় পেওনা। বাহিরের দিক্ থেকে তোমরা অত্যন্ত তীব্র বিরহবেদনা অনুভব করতে পার ; কিন্তু অন্তরে একপ্রকার অতুলনীয় রস, একটা সুখকর প্রশান্তি, আনন্দ অথবা ecstacy অনুভব করবে। বাহ্যে বিরহ্ জ্বালা, অন্তরে প্রেমসুখাস্বাদন।

এই ভাবে আমরা শাস্ত্রের কথাতে পাই ; আর নিজের অন্তরের অনুভবও ঐ সূক্ষ্মতম ব্যাপার অনুমোদন করে। ইংরাজী কবি সেলি (shelley) লিখেছেন—

"Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought."

যখনই আমরা কোন মহাকাব্যে নায়ক-নায়িকার নির্ম্মম তীব্র বিরহগাথা শ্রবণ করি, তখন তাতে চোখে জল আসলেও তা এত মধুর যে তা শুনা বা পড়া বন্ধ করি না—এইটাই ঐ বিরহবেদনার চমৎকারিতা। যখন আমরা অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীর নির্জ্জন বনে নির্বাসনের দুঃখের কাহিনী পড়ি তখন আমরা চোখের জল ফেলি, কিন্তু পড়া ছাড়তে পারি না। দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দ আছে, এই তার প্রমাণ।

কৃষ্ণের কাছ থেকে বিরহ ঠিক এই প্রকার। কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষত্ব

এই প্রকার। বাইরে তীব্র বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আগ্নেয়গিরির লাভার মত বয়ে যেতে থাকে, কিন্তু অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি আসে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকে তাই প্রকট করেছেন। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করলে আমাদের ঐ প্রকার দুঃখানুভবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বৃন্দাবনে প্রবেশের এইটিই পাথেয়। আর যখন আমরা আমাদের মতই বিরহবিধুর আরও বহু ভক্তকে দেখব তখন আমাদের মর্মবেদনার অন্ত থাকবে না ; সুখানুভবের সীমা থাকবে না। অন্যেরাও আমাদের সান্ত্বনা দিতে থাকবে। এই জন্যই ত' ভয়ের কোন কারণ দেখি না। এসব সত্ত্বেও আমরা জানি সেই ধামই আমাদের নিত্য বাসস্থলী। আমরা স্বধামে—প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে চাই।

সেখানে আমরা বিদেশী নই। এখানেই আমরা বিদেশী। এখানে সকলেই আমাকে তার কাজেই লাগাতে চায়। কিন্তু বৃন্দাবন ধাম ত' আমার নিজের বাসস্থান। সেখানেই ত' আমার সব কিছু ; অন্তরের শান্তি-তৃপ্তি সব সেইখানেই আছে। এখানে থেকে প্রকৃত সুখ-শান্তি কি বস্তু তা জানতেই পারি না। এইটাই এখানে আমাদের অসুবিধা। তাই আমরা কৃষ্ণচেতনায় যতখানি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকি, ততখানি প্রকৃত বাস্তব সুখের সন্ধান পেতে থাকি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও চমৎকারিতার আস্বাদন পেতে থাকি—এইভাবেই আমরা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগোতে থাকি। শ্রীল যমুনাচার্য্য বলেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব-নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ।।

"ব্রজের কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান যতদিন পর্য্যন্ত পাই নাই ততদিন পর্য্যন্ত জগতের সুখটাই আমার কাছে খুবই মূল্যবান মনে হত, কিন্তু এখন মনে কোন জাগতিক সুখের কথা এলেই মনে বিকার আসে, ঘৃণায় থুথু ফেলতে ইচ্ছা করে।"

তাই আমরা যখন কৃষ্ণপ্রেমরসের একবিন্দুর আস্বাদন পাই, তখন বুঝতে পারি জগতের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ তার তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি হেয় মনে হয়, আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই ভূমিকায় যেতে পারলে জগতের কোন দুঃখ-যন্ত্রণাই তাতে বাধা দিতে পারে না।

এর আর একটা দিকও আছে। যদিও আমাদের কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ সহনের জন্য উপদেশ দেওয়া যায়, কিন্তু আসলে তা দুঃখই নয়। কৃষ্ণ নিজেই বলেন—

"ময়ি তে তেষু চাপি অহম্"

আমি সব সময় আমার ভক্তগণের সঙ্গেই থাকি। যেখানেই একজন ঐকান্তিক ভক্ত থাকেন, কৃষ্ণ ছায়ার মত তার কাছে কাছেই থাকেন, যদিও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। এইটিই ত' কৃষ্ণের স্বভাব।

অহং ভক্তপরাধীনো
হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো
ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।

দুর্বাসাকে কৃষ্ণ বলেছেন, আমিত' আমার ভক্তেরই অধীন, দাস। ভক্তের ইচ্ছা ছাড়া কোন স্বঃতন্ত্রতাই আমার নাই। কারণ তারা

আমাকে শুদ্ধভক্তির দ্বারা বশ করে ফেলেছে। আমি সব সময় তাদের হৃদয়েই বাস করে থাকি। আমি শুধু ভক্তের অধীন নই, ভক্তের ভক্তগণেরও অধীন। আমার ভক্তের সেবক যারা, তারাও আমার ততখানি প্রিয়।

কৃষ্ণ ত' লাড্ডু নন! ঃ

আমরা কৃষ্ণের জন্য সবকিছু সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকব, এটা সত্যি, কিন্তু এতে নিরুৎসাহিত হওয়ার কিছু নাই। কৃষ্ণ প্রেমময়; আমাদের প্রতি তাঁর করুণার তুলনা নাই। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, "তুমি কৃষ্ণকে পেতে চাও? কৃষ্ণ ত' ময়রার দোকানের লাড্ডু নন যে কিনে নিয়ে টুপ্ করে গিলে ফেলবে! তুমি যখন সবচেয়ে সেরা জিনিষটা চাইছ, তখন তার জন্য সব কিছুতেই প্রস্তুত থাক।"

সেই বেলায় ভক্তগণও আমাদের কাছে এসে বলেন, "ভয় কিসের? আমরা ত' তোমারই মত। চল আমরা একসঙ্গেই চলি, ভয় নাই, আমরা ত' আছি।" শাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণভক্তগণ আরও কৃপালু। তাই আমাদের আশা-ভরসা ত' কৃষ্ণের ভক্তেরাই। আর কৃষ্ণ ত' নিজেই বলেন,

"মদ্ভক্তানাং চ যে ভক্তা"

আমার ভক্তের ভক্তরাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

তাই সাধুসঙ্গই আমাদের সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। কৃষ্ণের কাছে যেতে গেলে পথপ্রদর্শক বা guide ত' সাধুরাই।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।"

সমস্ত শাস্ত্রের সার কথাই হল সাধুসঙ্গ। এই সাধুসঙ্গের ফলে ভক্তিরাজ্যের সবকিছুই সহজে পাওয়া যায়। জীবনের চরমসিদ্ধিতে পৌঁছাতে গেলে সাধুসঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়-সম্পদ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী
মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্
অমৃতবিদ্যা (বাংলা, উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
Centenary Anthology
Golden Staircase
Heart and Halo
Home Comfort
Holy Engagement
Inner Fulfilment
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Sri Sri Prapanna-jivanamritam)
Loving Search for the Lost Servant
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III, & IV)
Sri Guru and His Grace
Srimad Bhagavad-Gita-
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Subjective Evolution of Consciousness
The Golden Volcano of Divine Love
The Search for Sri Krishna Reality the Beautiful

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
Original Source
The Divine Servitor

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

রচনামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম

শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার

শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী

শরণাগতি

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায়ও এই বই গুলির অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সি ডি, ক্যাসেট ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip Dt. Nadia, Pin 741302. West Bengal, India Ph. (03472) 240086 & 240752 **E-mail:** math@scsmath.com **Web site :** http://www.scsmath.com

Affiliated Main Centres & Branches Worldwide

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar pradesh, India
Phone : (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone : (0565)2456778

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India Ph : (06752) 231413

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Klokata, Pin 700055,
West Bengal, India
Phone : (033) 2590 9175 & 2590 6508

Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street
London E 13 9DB, U.K.
Phone : (0208) 552-3551

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, U.S.A.
Ph: (831) 462-4712 Fax: (831) 462-9472

St. Ptersburg
Pin 197229 St. Petersburg, P. Lahta
St. Morskaya b. 13, Russia
Phone : (812) 238-2949

Moscow
Str. Avtozavodskaya 6, Apt. 24a
George Aistov Ph : (095) 275-0944

Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia
Phone : (0266) 795541

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brazil
Phone : (012) 263 3168

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Phone : [+58] 212-754 1257

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820, Republic of South Africa
Tel : (011) 852-2781 & 211-0973
Fax : (011) 852-5725

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
1ro. de Mayo No. 1057,(entre lturbide y Azueta)
Veracruz, Veracrua, c.p. 91700.
Mexico Phone : (52-229) 931-3024

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
Mexico Phone : (52-33) 3826-9613

Sri Govinda Math Yoga centre
Abdullah Cevdet sokak, No 33/8,
Cankaya 06690 Ankara, Turkey
Phone : 090 312 44115857 & 090 312 4408882

Sri Chaitanya Saraswat Math International
Nabadwip Dham Street, Long Mountain
Republic of Mauritius
Phone & Fax : (230)245-3118/5815/2899

Villa Govinda Ashram
Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC)
Fraz. Regondino Rosso, italy
Tel : [+39] 039 9274445

ভক্তির পথ আশ্রয় করলে আমাদের অন্তরাত্মার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে এবং ক্রমশঃ জড়জগতের যাবতীয় charm — প্রলোভন দূর হতে থাকে। শরৎকাল এলেই যেমন জলের কাদাগুলো আপনিই তলায় পড়ে যায়, জল নির্মল হয়ে যায়, তেমনি কৃষ্ণচেতনা যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আর সব কামনা বাসনা, অন্য সব চিন্তাধারা আপনা হতেই ক্রমশঃ মন থেকে সরে যায়, কৃষ্ণচিন্তাই হৃদয়টাকে পুরোপুরি অধিকার করে। কৃষ্ণের একবিন্দু কৃপা মন থেকে, হৃদয় থেকে সবকিছুকেই সরিয়ে নিজেই ভক্তের হৃদয় দখল করে। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কাছে কেউই দাঁড়াতে পারে না। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও চমৎকারিতা সব শক্তিকেই হার মানায় — বশ করে ফেলে। আমরা ত' বাস্তবিকই কেবল সৌন্দর্য্য, মার্ধুয্য, করুণা, ও প্রেমের পিয়াসী। আত্মস্বার্থ ত্যাগের মধ্যে এমন বল ও ঔদার্য্য রয়েছে, তা সব কিছুর উপরেই জয়লাভ করে — সব অভাবকেই পূরণ করে নেয়। চরম ত্যাগ, চরম উৎসর্গ কেবল কৃষ্ণচেতনার মধ্যেই সম্ভব।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক অঃ প্রঃ ভাষ্য)